যে ভাবে আমরা বাস করি



স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল ব্রডকাস্টিং, শিক্ষাবিভাগঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যে ভাবে আমরা বাস করি

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
অনূদিত

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত
সম্পাদক : বাঙলা সংস্করণ

স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল ব্রডকাস্টিং
শিক্ষাবিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম প্রকাশ (বাঙলা সংস্করণ)
১৫ই অগস্ট, ১৯৬৫

প্রকাশক
সেক্রেটারি, স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল ব্রডকাষ্টিং
শিক্ষাবিভাগ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট ঃ প্রেমা মাগো

দাম—১·৭৫

নিবেদন

'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' নামে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের একটি ইংরেজী ভাষণ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 'এক্সটার্নাল সার্ভিসেস' কর্তৃক বেতারযোগে প্রচারিত হয়। এই ভাষণটি পরে 'ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি' নামে একটি ইংরেজী সংকলন পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অধ্যাপক কবিরের উক্ত ভাষণটি বর্তমান পুস্তিকার ভূমিকারূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রস্তুত পুস্তিকাটি ভারত সরকারের 'আধুনিক ভারতীয় ভাষাবলীর উন্নয়ন' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর প্রকাশনার অর্ধেক ব্যয় ভারত সরকার বহন করেছেন।

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদকের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সুশীলকুমার গুপ্ত

সম্পাদক ঃ বাঙলা সংস্করণ

ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ ও জটিল যে কোন একটি বিশেষ সূত্রের মধ্যে একে ফেলা যায় না। বিরোধ ও বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন ও বিশাল দেশের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এ ছাড়া যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ নানাপ্রকার বিচিত্র চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। যা হোক, যে সকল বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র করেছে, সেগুলির উল্লেখ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এর সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য। সেই প্রাচীন ভক্তিবস্তু (fetish) জাতীয় মতবাদ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধিগ্রাহ্য অদ্বৈতবাদের তত্ত্বীয় সংজ্ঞা পর্যন্ত সকলপ্রকার ধর্মবিশ্বাস এখানে প্রচলিত দেখা যায়। এখানে এমন সব লোক আছেন যাঁরা বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট দেবদেবীর উপাসনা করেন, আবার এমন বহু লোকও বর্তমান যাঁদের ধারণায় ঈশ্বর নিরাকার তো বটেই, এমনকি তিনি নামহীনও। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেও প্রতিটি ধারণাযোগ্য শ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায়—পুরাকালের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে উচ্চ অভিজাত গোষ্ঠীর আড়ম্বরবহুল ব্যাপক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান পর্যন্ত। মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরের প্রতীকরূপে ভারতবর্ষকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের স্বর্গ, এই সঠিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যা কিছুই ভারতীয় পদবাচ্য—তা একটি ভাববস্তুই হোক, উক্তি, শিল্পরূপ বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক প্রথাই হোক,—সবই বিভিন্ন বিরোধী-শক্তি ও উপাদানের সংযুক্ত প্রকাশ। তথাপি এই ব্যাপক বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে ক্রমশই এমনই অবিসংবাদী স্বকীয়তা আছে, যা সব কিছুকেই ভারতীয়রূপে প্রকাশ করে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সজীবতা এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের ছাত্রদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। এখানে বড় বড় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

বিপর্যয় ঘটেছে, বহু নূতন নূতন জাতি ও বিভিন্ন গোষ্ঠী সকল সময়েই ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে আছে তা নয়, সে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সংস্কৃতির মূল্যবান উৎসবের সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। প্রাচীন যুগে পৃথিবীর কোন কোন অংশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু রমণীয় পুষ্পের সমাহার ঘটেছিল, কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তাদের অধিকাংশেরই আর চিহ্ন নেই। আবার পৃথিবীর কোন কোন অংশে নূতন সংস্কৃতির পুষ্পদল যে বিকশিত হয়নি তাও নয়, কিন্তু সে সবই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবশ্য সংস্কৃতির পরম্পরা কোন অবস্থাতেই অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। পুরাতন সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, নূতনের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য ব্যাহত হয়নি। এই ঐক্য যে অব্যাহত রয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এর মূলে আছে 'ভারতীয়তা-বোধ'—এই বোধই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছে—জাতীয় জীবনের ঐক্যের টানায় বিভিন্ন ধরনের গ্রথন (texture) ও রঙের পোড়েন হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভারতীয় বোধ এবং এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কিভাবে বর্ধিত হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, কালের দাবীর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের মানিয়ে নেওয়ার এক অদ্ভুত শক্তি আছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার শক্তিই জীবনের তুলাদণ্ড। ভারতীয় সংস্কৃতির সুদীর্ঘ অব্যাহত জীবনযাত্রার মূলে আছে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ও চিন্তাধারার মানিয়ে নেওয়ার স্থিতিস্থাপক শক্তি যার তুলনা মেলে না। ভারতবর্ষের গৌরবময় দিনে সে কারো দান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। গ্রীসীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও নানাপ্রকার ব্যবহার-সাপেক্ষ চৈনিক আবিষ্কারের দ্বারা ভারতবর্ষ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। কোন কিছুই তার কাছে নিষিদ্ধ ছিল না। যা কিছু মানবীয়, তাই সে তার সীমানাভুক্ত করেছিল।

দুটি বিরোধী কিন্তু সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে সজীবতা ও স্থিতিস্থাপকতা এনেছিল। একটি হচ্ছে, ভারতের সমন্বয়সাধনের ক্ষমতা, যা অন্যান্য সমাজে অসঙ্গত বিষয় হিসাবে গণ্য হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচতে সাহায্য করা ভারতবর্ষের মূল নীতি। যে কোন ধর্মমত ভারতবর্ষে আশ্রয় চেয়েছিল, ভারতবর্ষ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল—ইতিহাসে সম্ভবতঃ এরকম দ্বিতীয় নিদর্শন আর দেখা যায় না। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই খৃষ্টীয় মতবাদ ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করেছিল এবং কোনপ্রকার রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিপক্ষতা না পাওয়ায় এর

স্বকীয় জীবনধারা অব্যাহত ছিল। এই সময় জোরাষ্ট্রিয়ানেরা ইরান থেকে পালিয়ে ভারতবর্ষেই নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিল। জুডাইজম্ ভারতবর্ষে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। ধর্মগুরুর মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই ইসলাম ভারতের মাটিতে প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে নিরুপদ্রবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কোন মতবাদই ইসলামের ভারত প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেনি। আবার মধ্যযুগের শেষের দিকে পর্তুগীজেরা যখন ক্যাথলিক মতবাদ ভারতে প্রচার করেছিল, তখনও কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে তাদের বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়নি।

এই সহনশীল মনোবৃত্তি থেকেই ভারত সমন্বয়ের শক্তি অর্জন করেছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় যে সকল বিভিন্ন মতবাদ এনেছিল, সেগুলিকে একটি সংশ্লিষ্ট রূপ দেবার শক্তি অর্জন করেছিল। আর্যেরা, সম্ভবতঃ কিছুটা সংস্কার করে, দ্রাবিড় ও আর্য-পূর্ব সম্প্রদায় সকলের দেবদেবীগণকে গ্রহণ করেছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের যা কিছু মূল্যবান তা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের মধ্যে সংযুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক মতবাদেরই সত্যতা আছে, কারণ সত্য হচ্ছে একই সত্তা সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন স্তরের অন্তর্দৃষ্টির ফল—এই সত্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছিল। এই কারণেই ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন তাদের মূল সত্যগুলিকে গ্রহণ করতে ভারতবর্ষের বাধেনি। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার অপূর্ব সংমিশ্রণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা একটি নূতন ধর্মীয় ও দার্শনিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। খাজা মইনুদ্দিন, কবীর, নানক, শাজালাল, রামানন্দ, চৈতন্য ও নিজামুদ্দিন প্রভৃতি কবি ও সন্তদের নাম আজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে শোনা যায়। বাঙলার বৈষ্ণব-মতবাদ ও মহারাষ্ট্রের ভক্তিবাদকে মধ্যযুগের ধর্ম-সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে নব্য হিন্দুধারা ও ব্রাহ্ম মতবাদের আবির্ভাবের মধ্যেও সেই একই ধারা লক্ষিত হয়।

এই পরমতসহিষ্ণু ও সমন্বয়ী মনোবৃত্তি এক গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অধ্যাত্মবোধ ভারতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা অতি সামান্য এবং তা সহজেই পরিতৃপ্ত হয়। কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া ভারতবর্ষের আবহাওয়া অতি মনোরম। এর ফলে এখানকার মানুষ তত্ত্বীয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করার অবসর গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল প্রচুর। সেই জন্যে ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে সর্বদাই জীবনের রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। জীবনদর্শন সম্পর্কে তার একটি নিজস্ব বোধ আছে। ভাগ্য ও

পরিবেশ সম্পর্কে তাই সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নির্লিপ্তভাবে সেই জীবনদর্শনের বিষয় আলোচনা করতে পারে, যা অনভ্যস্ত বিদেশীর কাছে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষেরও এই দার্শনিক বোধ ও সহনশীলতা দেখে জনসাধারণ প্রায়ই বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে। পাশ্চাত্ত্যের অনেক দেশে মানসিক প্রস্তুতি ও বুদ্ধির সামর্থ্যের দিক দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকখানি বিভেদ দেখা যায়। কারিগরি-বিদ্যার উন্নতিতে পাশ্চাত্ত্যে এই ধারার কোন পরিবর্তন হয়নি ; অপরপক্ষে তা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। এমন কি ভারতের অনগ্রসরতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পকুশলীদের নৈপুণ্য ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে খর্ব করতে পারেনি। ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য তা গুণগত নয়, সেটাকে তথ্য ও সুযোগের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বলা যায় যে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের মূল্য নির্ধারণ করেছে। কেবলমাত্র এ দেশের ভৌগোলিক দিক দিয়ে নয়, গোষ্ঠীর ভাষা, প্রথা ও বিশ্বাস, রাজনৈতিক সংস্থা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের এই আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্য বহুকে গ্রহণ ও বহুর মধ্যে এককে আবিষ্কার করবার পক্ষে ভারতীয় মনকে প্রস্তুত করেছে। প্রাচীন আর্য আক্রমণকারীরা বা যারা এই দেশে এসেছিল তাদের পক্ষে এটা একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল যে, তারা এই বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির একটা দার্শনিক ভিত্তি উপস্থাপিত করেছিল। ভারতীয় দর্শন মূলতঃ ব্যবহারমূলক এবং তা ভারতীয় জীবনকে একটি ঐক্যে সংহত করবার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করেছে। এর ফলে এই সমস্ত বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয়েছে পরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশরূপে। যা আমরা দেখি, শুনি বা অনুভব করি, তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত চরম সত্তার উপর বিশেষ মূল্য দেওয়ার জন্যে ভারতীয় মন এমনভাবে প্রস্তুত হয়েছে যে, তারা শান্তভাবে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে এবং জীবনের উচ্চতর আদর্শের দিকে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রয়াস পেয়েছে তার অভাবকে সীমিত করে—বিলাসিতার উপকরণকে বৃদ্ধি করে নয়। ভারতের বহু মহান্ ব্যক্তি ও মহীয়সী নারীর জীবনের মূলে আছে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তাধারা।

একান্ত জাগতিক বা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক না হয়েও ভারতীয় দর্শন মনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীকে উদ্বুদ্ধ ও সার্থক করতে সহায়তা করেছে। জগতের বিচিত্র রূপকে

স্বীকার করে নিয়েও সত্তার ঐক্য স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে। সৎ ও চিৎ এই উভয় সংজ্ঞাই হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিব্যাপক নীতির প্রকাশ। প্রাচীন ভারতের এই সহনশীল, সমন্বয়ী এবং মোটামুটিভাবে ব্যাপক চিন্তাধারার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি যুগ যুগ ব্যাপী স্থিতি-স্থাপকতা ও নমনীয়তা লাভ করেছে, এবং এই কারণেই তা সমগ্র জনসাধারণকে পরিব্যাপ্ত করেছে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্নতা ও গতির সকল প্রকার বিরোধিতাকে বাধা দিয়েছে।

এই সমন্বয়ের ধারা আজও অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয়ের সংগীতকেই এক মহান্ গাথায় গ্রথিত করেছেন, যা ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদালাভ করেছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়ে এই সমন্বয়কেই প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় গণতন্ত্র এই সমন্বয়কেই তার সংবিধানভুক্ত করেছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচেতনার দ্বারা, যা ভাষা, সম্প্রদায়, জাতি ও নরনারীর ব্যবধান নির্বিশেষে সকল নাগরিককেই সমান অধিকার দিয়েছে। দেশকালের ব্যবধানের সংকোচনের ফলে এই সমন্বয়ী মননধারা মানবমনের উৎকর্ষকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করবে। এই সমন্বয়ের নবীকরণ ও বর্ধনশক্তির মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য, পারম্পর্য ও সমৃদ্ধির রহস্য নিহিত আছে।

হুমায়ুন কবির

যে ভাবে আমরা বাস করি

এই পুস্তকখানিতে যে-সকল রচনা প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগই প্রথমতঃ 'সিমপোজিয়া'র জন্যে রচিত এবং ১৯৬০ সালে 'কালচারাল ফোরাম'-এর দুটি ধারাবাহিক সংখ্যায় প্রকাশিত। এগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতীয় উপ-মহাদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির আপাতবৈষম্যের মধ্যে সেই মূল বস্তুটিকে নির্দেশ করা, যা ভারতের প্রাদেশিক সংস্কৃতিগুলি থেকে পৃথক।

সাম্প্রতিক কয়েক মাসের মধ্যে এই সুদূরবিস্তারী দেশের জনসাধারণকে ভাবগত একীভূতকরণের প্রয়োজন সম্পর্কে অনেক কথাই বলা ও লেখা হয়েছে। একথা কেউই অস্বীকার করে না যে উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রদেশগুলির মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে, এমন কি বৈপরীত্যও আছে। বর্তমানের মাধ্যমে অতীত এই কথাই বলতে চায় যে, যে-ভাবে একটি প্রদেশের জীবনধারা পরিচালিত হয় তা বহুলাংশে স্থিরীকৃত হয় উপমহাদেশের জীবনে সেই প্রদেশটি তার অচিরস্থায়ী অতীত এবং স্থায়ী ভূগোলের সাহায্যে কি অংশ গ্রহণ করেছে তার দ্বারা। মহারাষ্ট্রকে যদি পরিশ্রমী বলা হয়, তাহলে পঞ্জাব সামরিক, মহীশূর শিষ্টাচারী, রাজস্থান রোম্যান্টিক, বাংলা সমস্যাপ্রধান, উত্তর প্রদেশ তার্কিক, কেরালা প্রাণবান, মাদ্রাজ শিক্ষানুরাগী, বিহার জেদী এবং কাশ্মীর নমনীয়—এই সব বৈশিষ্ট্য যে অতীত-ইতিহাস এবং ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচারের দ্বারা যুক্তিসিদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা কোন ঐতিহাসিকেরই অজ্ঞাত নয়।

এই বহুবিধ জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দ্বারাই এই উপমহাদেশটিকে বিশদভাবে বোঝা যাবে। কেবলমাত্র এই রকম মেলামেশার উপর ভিত্তি করেই একীভূতকরণের প্রচেষ্টা সম্ভব হতে পারে। সম্ভবতঃ, খাঁটি ভারতীয় হচ্ছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমেরই মিশ্রণ। কোন জাতিই অবশ্য কোন একটি প্রণালী, সূত্র বা এমন-কি কোন উপদেশের দ্বারা একীভূত হয় না। অনেক সময়ে এটা আমরা ভুলে যাই যে, 'সংস্কৃতি' বলতে বোঝায় বৃদ্ধি। স্থিতিশীল সংস্কৃতি উক্তিটি স্ববিরোধী এবং যা নিশ্চল তা বৃদ্ধিলাভ করে না। পৃথিবীর তরুণ দেশগুলি—দি ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড, যাদের সম্বন্ধে কখন কখন বিদ্রূপ করে বলা হয় যে তাদের সভ্যতা আছে কিন্তু তাদের সংস্কৃতি খুব স্পষ্ট নয়, তাদের অন্ততঃ এই জ্ঞানটুকু জন্মেছে যে, বৃদ্ধিলাভ করা একান্ত প্রয়োজন এবং নিজেদের

মধ্যে সেই শক্তিকে সঞ্জীবিত করতে হবে যাতে বৃদ্ধিলাভ করা যায়। এই দিক দিয়ে প্রাচীন জাতিগুলি যারা পরিতুষ্ট সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে তাদের তুলনায় তারা অধিকতর জ্ঞানী।

সামগ্রিক একীভূত সাংস্কৃতিক বৃদ্ধির অপরিহার্য উৎস হচ্ছে, সাধারণ স্বার্থ-সমূহ, উদ্‌বর্তনের প্রতি একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতকগুলি আদর্শের সাধারণ স্বীকৃতিলাভ। এই লক্ষ্যের দিকে কেবলমাত্র ধীর গতিতেই আমরা অগ্রসর হতে পারি। আমাদের বহুবিধ জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতিলাভই একীকরণের সহায়তা করবে এবং এটাই আজ আমরা ভারতবর্ষে একান্তভাবে কামনা করছি।

সম্পাদক (মূল ইংরেজী সংস্করণ)

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতি জন্মগত অভিজাত গোষ্ঠী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্কৃতি। তাদের বিশ্বাস যে তারা মার্জিত ভাষায় কথা বলে, উচ্চ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং তাদের কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে এমন একটি ভাব আছে যা বহুজনের হিংসার কারণ হয়েছে বা হওয়া উচিত। এই প্রাধান্য প্রকৃতির ইচ্ছাপ্রদত্ত এবং সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে তারা এই অবস্থা লাভ করেছে।

এই উক্তি আপাতদৃষ্টিতে অতিশয়োক্তি বলে মনে হলেও, বস্তুতঃ এটা কম করেই ধরা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এর যে কোন দেশপ্রেমিক এটি প্রমাণ করে দেবে এবং সমগ্র উত্তর প্রদেশে এমন কোন দেশদ্রোহী নেই যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে।

উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির সপক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হচ্ছে সেখানকার ভাষা। এই ভাষাদ্বারা সকল কিছুই সাধিত হয়। নম্রতা, ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার প্রাচুর্যের দিক দিয়ে পারস্য ভাষার সঙ্গে এই ভাষা সমতুল্য, কিন্তু ব্যঙ্গোক্তি, ব্যাজস্তুতি ও কটূক্তি করার মাধ্যম হিসাবে এই ভাষা পারস্য ভাষাকেও অতিক্রম করে গেছে। এত অধিক গালিগালাজ করার মত শব্দ অপর কোন ভাষায় আর দেখা যায় না এবং সেই সকল শব্দের ব্যবহার এতটা যত্নের সঙ্গে অপর কোন ভাষায় অনুশীলিত হয়নি। ভাষার সার্বিক ব্যবহারের দিক দিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উত্তর-প্রদেশে সকল রম্য কলার মধ্যে সব চেয়ে রমণীয় হচ্ছে কথোপকথন। উত্তর প্রদেশের লোকদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের কারণ এটাই। উত্তর প্রদেশের লোকেরা সকল সময়েই সানন্দে অপর সকলকে আলাপ-আলোচনার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে এবং সকল সময়েই নিজেদের জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভাব প্রকাশ করার কারণ তাদের ভাষা এই ধরনের। স্বভাবতঃই, তাদের জীবনাদর্শে তারাই বাঁচবার যোগ্য যারা এই কথোপকথনে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তারা কখনই ভুল করতে পারে না।

খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়েও উত্তর প্রদেশ সবার উপরে। যে কোন মিষ্টান্নের কথাই ধরা যাক না কেন, উত্তর প্রদেশের কোথাও না কোথাও তা মিলবেই এবং তার সর্বাপেক্ষা যা উৎকৃষ্ট তাই-ই পাওয়া যাবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসাধারণের মতো এখানকার জনসাধারণ সংকীর্ণ রুচিসম্পন্ন নয়। 'রসগোল্লা' নামবিশিষ্ট একপ্রকার মিষ্টি বাংলা দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু যতদিন এই মিষ্টি দ্রব্যটি 'রসগোল্লা' এই সুন্দর নামে

অভিহিত হয়নি, ততদিন এই দ্রব্যটি একপ্রকার অপরিজ্ঞাতই ছিল। রন্ধন-প্রণালীর দিক দিয়ে আমিষাশী বা নিরামিষাশী যে কোন লোকই হোক না কেন, সুরন্ধিত 'কাবাব'-এর চেয়ে অধিক লোভনীয় তার কাছে আর কি কিছু হতে পারে? কেউ কি কোথাও এমন কিছু খাবার দেখাতে পারেন যা পুলাও, মুতাঞ্জন ও লক্ষ্ণৌ-এর পরটাকে হার মানাতে পারে? তুর্ভাগ্যবশতঃ এমন বহুলোক আছে যারা আসল জিনিস না খেয়েও এ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং অহংকার করে বলে যে, তারা এটা রাঁধতেও পারে। তাদের এই রাঁধবার খেয়ালকে কেউ বাধা দিতে পারে না, ফলে খাদ্যবস্তু ও তার নামের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই থাকে না। অজ্ঞ সৌখীন রন্ধনকারী এবং আড়ম্বরপ্রিয় গৃহকর্ত্রীদের প্রাতুর্ভাবে অভিজ্ঞ গুণী রন্ধনকারীদের স্থান আর নেই। তাই খাদ্য এখন আর কোনো সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের মধ্যে পড়ে না; জৈব ক্ষুধার তাড়নায় কোন কিছুই না জেনে এখন সব কিছুই মানুষ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে। আরও তুঃখের বিষয়, খাদ্যবস্তুর এত অবনতি ঘটেছে যে, এখন সেটা থালা থেকে মুখে তোলার ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে,—যেমন ভাষার অবনতি ঘটেছে নিছক আদান-প্রদানের মাধ্যম হওয়াতে। যেন এ সম্বন্ধে সৌষ্ঠব প্রকাশের কোন বালাই নেই। তুমি চীৎকার করে তোমার খাবারের থালাটা তোমার দিকে এগিয়ে দিতে বলতে পার, কতটা খাবে সেটা তোমার উপর নির্ভর করে। তুমি টেনিস বলের মতো ভাতের গোলা পাকিয়ে খুব দ্রুত তা গলাধঃকরণ করতে পার, যা দেখে উত্তর প্রদেশের যাতুকরও হতভম্ব হয়ে যাবে; তুমি কচমচ শব্দ করে খাবার চিবিয়ে খেতে পার; তোমার আঙ্গুলগুলো ঘি, ঝোল ও ডালে মাখামাখি করতে পার। প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করতে অতিথি ভদ্রভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, সে যে পর্যাপ্ত আহারে তৃপ্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধে খাদ্যের কোন প্রশংসাও করে না; অতিথি যা দেয় তা গ্রহণে গৃহস্বামী কুণ্ঠিত হয় না বা অতিথি যে তার আহার্য গ্রহণ করেছে তাতে নিজেকে কৃতার্থ বোধও করে না। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে এতই বিস্মৃত হয়েছি যে খাবারের ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের আদব-কায়দা গ্রহণ করেছি। উত্তর প্রদেশ যতখানি পেরেছে এই ধারার গতিরোধ করেছে। এখন এটা তুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে, আহারের ব্যাপারটার মধ্যে সংস্কৃতির আর কোন সংযোগ নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও বিশৃঙ্খলার সূচনা দেখা দিয়েছিল, যখন বিলেতী কাপড়ে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল এবং উত্তর প্রদেশের মেয়েরা যখন সরকারী কর্মচারীদের আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করতে আরম্ভ করেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তারা ইওরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তারা রুচির বিকৃতি থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি।

উত্তর প্রদেশের যে বস্ত্রাদি তার বিশেষত্ব ছিল তা বিদেশী বস্ত্রাদির অনুকূলে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং মেয়েদের যে পোশাক-পরিচ্ছদের উপর তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত সম্পূর্ণরূপে তার মানের বিলুপ্তি ঘটেছে। তাঁতশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা, এবং বয়নশিল্পের প্রাচীন কারুকার্য ও নক্‌শার পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও আসল অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উত্তর প্রদেশের পোশাক-পরিচ্ছদ আর পূর্বের ন্যায় বিচিত্র রঙের জলুসে উজ্জ্বল নয়। পশ্চাৎ দিকে বিলম্বিত বা উপর দিকে কুণ্ডলিত এবং বাম বাহুর উপর বিস্তৃত কলি-দার পায়জামা এখন কেবলমাত্র উত্তেজনাময় স্মৃতির বিষয়। শাড়ি, যার কোন স্বকীয়তা নেই, যেহেতু তা সকলেরই পরিধানযোগ্য, একদিন সেই শাড়িই উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

যারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মান, প্রতিষ্ঠা ও তার অনুসরণে বিশ্বাসী, তাদের নানাবিধ প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন প্রথমেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা উত্তর প্রদেশ বলতে সত্যিকার কি বুঝি? আমরা কি এই বুঝি যে, উত্তর প্রদেশ হচ্ছে প্রাক্‌ বৃটিশ যুগের অযোধ্যা রাজ্য, না উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, না বৃটিশ যুগের যুক্ত প্রদেশ? আবার উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতি বলতে কি আমরা সাহারানপুর থেকে মোঘলসরাই এবং নৈনিতাল থেকে ঝাঁসি পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের এক সংস্কৃতি বুঝি। উত্তর প্রদেশের লোকেরা জানে যে, উত্তর প্রদেশকে নস্যাৎ করবার এ-এক হীন চক্রান্ত। সংস্কৃতির আলোচনার ব্যাপারে লক্ষ্ণৌ-এর প্রসঙ্গ অবশ্যই ওঠে এবং লক্ষ্ণৌবাসীরা দুর্জয়ভাবে রুচিবাগীশ ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী। এমন কি লক্ষ্ণৌকে সংস্কৃতির পীঠস্থান বলা যায় এবং এই পীঠস্থানের ব্যাপার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, লক্ষ্ণৌ হচ্ছে কতকগুলি পরিবারেরই একটি নাম এবং তাদের কতকগুলির অস্তিত্ব কেবলমাত্র নামের মধ্যেই পর্যবসিত। উত্তর প্রদেশের লোকেরা সেই কারণে সাধারণভাবে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের কথাই বলতে চায়, সেই রাষ্ট্রের বিশেষ কোন অংশ সম্পর্কে নয়। ফলে, বাস্তব ঘটনার চেয়ে তারা ভাবরূপের বিষয়েই আলোচনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের আচরণে সবচেয়ে আত্মাভিমানের ভাবটাই প্রকট। তাদের আচরণে এটাই প্রকাশ পায় যে তাদের নিজেদের ব্যাপার ও নিজেদের চিন্তাধারা ব্যতীত তারা আর কারো সম্পর্কে বা কোন কিছুর বিষয়ে উৎসাহী নয়। পরিবর্তন ও উন্নতি, শিল্প ও সমৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি বা সুখবৃদ্ধির সব সম্ভাবনাই তাদের কল্পনাতে বিরাজ করে। তারা যেমন অগ্রণী হতে পারে, তেমনি তারা সবচেয়ে পিছিয়েও থাকতে পারে। তারা সব কিছুই করতে পারে, কারণ তারা বাক্যালাপে ধুরন্ধর।

এম. মুজীব

কেরালা

ভাব ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে আমরা এক অখণ্ড জাতি ভাবি ও বলে থাকি। এর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরম্পরা। এই ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ভাষা ও কতকগুলি প্রাদেশিক ঘটনার দ্বারা ভারতবর্ষ বিভক্ত। ফলে, ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলের একটি স্বকীয় জীবনধারা গড়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা হয়েছে, কারণ এটিই আমাদের জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে। ঐক্য বা সাম্য যেমন একদিকে আমাদের বোধকে সহজ করে, তেমনি বিচিত্র জাতীয় জীবনের জটিলতাই তার গভীরতা ও সমৃদ্ধির দ্বারা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে।

পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে পাথর ক্ষয়ে তৈরী লাল মাটি যেখানে মনোরম গাছপালা, ঘাটগুলির নীল পাহাড় ও আরব সাগরের সবুজ জলরাশির সঙ্গে মিশেছে সেইখানে রয়েছে দেবতা ও মানুষের আশীর্বাদ ধন্য গার্হস্থ্য-জীবনের এক অপরূপ সৌন্দর্য। এখানে এলে যে সবুজের সমারোহ মনের উপর এক গভীর ছাপ ফেলে তা অধিকতর মনোরম হয়ে উঠেছে বদ্ধ জলাশয়ের তীরবেষ্টিত তালবৃক্ষরাজির পত্রসমূহের সুশোভন সঞ্চালনে। কেরালার উৎপত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত। পরশুরাম বা বিশ্বকর্মা যে-কেউই স্থানটিকে সৃষ্টি করে থাকুন না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন সৃষ্টির স্থপতি। তিনি ব্রহ্মাকে পরাজিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের সৃষ্টিলীলায় অদ্বিতীয় সৌন্দর্যময় কিছু সৃষ্টি করে। সুন্দর এই কেরালা, যে ভাবেই একে বর্ণনা করা হোক না কেন, তবু সবটা যেন বলা হয় না।

কেরালার জীবনধারা অপরাপর অঞ্চল থেকে পৃথক। সেদিনও সেখানকার হিন্দুরা সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে মাতৃ-পরম্পরা স্বীকার করত। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম পরিচিত হওয়ার বহু পূর্বেই এখানকার খৃষ্টীয়েরা সে ধর্মের দাবী জানিয়েছিল। ইহুদী-বিদ্বেষ পশ্চিমের নবজাত গণতন্ত্রের উদার মনোভাবকে কলঙ্কিত করার বহু পূর্বে ইহুদীরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা ইহুদী, এদের প্রত্যেকেরই জীবনের বিশেষত্ব হচ্ছে সরলতা, পরিচ্ছন্নতার প্রতি গভীর অনুরাগ, এমন কি পরস্পরের ধর্মের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা। ধর্মোন্মত্ততার কদর্যতা কেরালায় কখনও মাথা তুলতে পারেনি, যদিও কেরালা এমন একটি দেশ যেখানে গগনস্পর্শী গোপুরম

মন্দিরশ্রেণী ও গির্জার চূড়াগুলি সমভাবেই তালবৃক্ষশ্রেণীকে অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠেছে। ধর্মসম্বন্ধীয় বিরোধ বা সংঘর্ষ কেরালায় একপ্রকার নেই বললেও চলে ; থাকলেও তা অতি নগণ্য। সত্যকারের ভক্তেরা কেরালার মন্দিরে উপাসনা করতে পারে, সাধু-সন্তদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে বাতি দিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে অধ্যাত্মবিষয়ে মুসলমান থঙ্গলের (Thangal) মতামত গ্রহণও করতে পারে। সব পথই ঈশ্বরের পথ এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ধর্মমত নির্বিবাদে অনুসরণ করতে পারে। হিন্দু রাজারা দীর্ঘদিন কেরালা শাসন করেছেন এবং জনসাধারণের জন্যে সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার নিদর্শন রেখে গেছেন। উষ্ণ আবহাওয়া ও প্রকৃতিদত্ত স্বচ্ছ জল 'পরিচ্ছন্নতার স্থান দেবত্বেরই পরেই' এই প্রবাদের সার্থকতাই প্রমাণ করেছে ; সম্ভবতঃ এটাই বলা ঠিক হবে যে, এই দুই বস্তু স্থানীয় জনসাধারণের জীবনে সমীকৃত হয়েছে।

কেরালার বহু বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টি বাইরের লোক ঠিক বুঝতে পারে না সেটি হচ্ছে, কি ভাবে সেখানে পুরুষের জন্মগত অধিকার অক্ষুণ্ণ আছে, যেখানে উত্তরাধিকারের বিষয়ে মাতৃ-পরম্পরা প্রচলিত। যাকে বলা হয় 'থরাওয়াড' (tharawad) বা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাযুক্ত বিস্তৃত পরিবার-পদ্ধতি যেখানে পুরুষ তার ক্ষমতানুসারে রোজগার করে ও মেয়েরা সেই ধন প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে তাই সমাজের মূলে রয়েছে বা পূর্বেও ছিল। তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করুক বা না করুক, পুরুষ এবং স্ত্রী নির্বিশেষে শিক্ষা তাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যাঁদের 'শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দ্বারা ব্যাহত হয়নি'। শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু সেই শিক্ষা যদি কোন কারণে না হয়, তা হলেও সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে শত শত উপায় আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কারকেরা স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বহু পূর্বেই এখানে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এবং তাকে কার্যকর করে তোলা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যে গ্রাম দেখা যায় কেরালায় তা অজ্ঞাত। একটি পরিবারকে অপর একটি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ঘরবাড়িসহ একখণ্ড জমির ব্যবস্থা কেরালার প্রচলিত নিয়ম। একজন মানুষের গলার স্বর যতদূর যেতে পারে, স্থানীয় ভাষায় বলা যায়, কেরালায় একটি পরিবারের সঙ্গে অপর একটি পরিবারের দূরত্বও ততখানি। এই অবস্থা চিন্তাক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা এনেছে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাদের গতিবিধিকে খর্ব করেছে। গৃহগুলির

এই পৃথক অবস্থানের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সামাজিক জীবনযাত্রায় যৌথ বা সমবায়ী প্রচেষ্টার অভাব ঘটেছে। এই কারণে কেরালার জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে অনমনীয় মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। ফলে, প্রকৃতগত ভাবেই তারা মামলাবাজ ও তার্কিক এবং সামান্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে বিরোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য প্রদেশে ধর্মোৎসব উপলক্ষে লোকসমাগম হয়, কেরালায় এ-রকম অনুষ্ঠান অতি বিরল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া যেমন সাধারণ ও অবশ্যকর্তব্য ব্যাপার, কেরালায় কিন্তু এরূপ কোন প্রথা নেই। এই কারণে, কেরালার সামাজিক-জীবন তৎসংশ্লিষ্ট যৌথ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ। কেরালায় বিবাহপ্রথাতেও ধর্মের কোন স্থান নেই। বিবাহ ব্যাপারে রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ার পূর্বে বিবাহ-অনুষ্ঠান অত্যন্ত সরল ছিল—সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তি এবং সাধারণের উপস্থিতি বিবাহের প্রাণস্বরূপ বিবেচিত হত। ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় ধর্মগত ও অধ্যাত্মিক মূল্য সম্পর্কে কেরালার গভীর বিশ্বাসই যথেষ্ট বড় রক্ষাকবচ যে বিবাহ পবিত্র ধর্মবন্ধন হিসাবেই গৃহীত হবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় সীতা-সাবিত্রীই হচ্ছে কেরালার নারীদেরও আদর্শ, এবং শালীনতা নারীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ভূষণরূপে বিবেচিত হয়। কেরালার হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে পণপ্রথা নেই। যেহেতু পরিবারভুক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার আছে এবং পৈতৃক বসতবাটীতে মেয়েদের অংশ বাধ্যতামূলক সেই হেতু পণপ্রথার কোন বোঝা তাদের ভোগ করতে হয় না। হিন্দু-কোডের আলোচনাকালে, পৈতৃক সম্পত্তিতে বিধবা কন্যার বসবাসের অধিকার সম্পর্কে আইন সভায় উত্তর ভারতের সদস্যদের বিরোধিতা লেখিকাকে বিস্ময়ান্বিত করে তোলে। কেরালার উত্তরাধিকার প্রথার মূল নীতিই হচ্ছে পৈতৃক বাসস্থানে মেয়েদের অধিকার। যদি কোন ব্যক্তি তার মা ও বোনকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে সে অতি দুর্ভাগা ও সামাজের নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে।

কর্ম ও পূজার্চনা কেরালায় সাধারণ জীবনধারার অঙ্গ। একমাত্র 'ওনম্' (Onam) ভিন্ন জাতীয় উৎসব মাত্রই ধর্মের অঙ্গীভূত। জন্ম, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, মৃত্যু—সকল প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ধর্মের যোগসূত্র আছে এবং তা ব্যক্তির জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আসন্নপ্রসবা জননী মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনায় কালাতিপাত করে এই উদ্দেশ্যে যে, তার সন্তান যেন সুন্দর ও বুদ্ধিমান হয়। সন্তান হিসাবে কন্যাই অপরিহার্য, কারণ বংশের ধারা কন্যার দ্বারাই রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের

অন্যান্য অঞ্চলের প্রচলিত প্রথার তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে বিপরীত, যেহেতু অন্যত্র কন্যারা অবাঞ্ছিতরূপে পরিবারে অবহেলিত হয়ে থাকে।

কেরালায় সমাজ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন মন্দিরের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়েছে, কারণ মন্দিরই চিরদিন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য হয়ে আসছে। কথাকলি, ওতম থুলল (ottam thullal) প্রভৃতি বিশিষ্ট নৃত্যকলাগুলি ও অন্যান্য স্বল্প-পরিচিত অথচ অধিকতর জনপ্রিয় কাহিনীমূলক সংগীত ও গাথাসমূহ মন্দিরেরই অঙ্গীভূত এবং সেগুলি সকল ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই সংযুক্ত।

একথা আজ সত্য যে, বহির্জগতের সঙ্গে অধিকতর সংস্পর্শ ও একীকরণ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় কেরালায় আজ বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে সমাজজীবনে নানা রূপান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু এটাই আশা করবার কথা যে, যে-বিশেষত্বগুলি তার নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, ধর্মপরায়ণতা এবং আনুগত্যের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সেগুলি বজায় থাকবে ; এবং যে সব গুণে তারা একটি পৃথক সম্প্রদায়রূপে গণ্য হয়েও এক বিশিষ্ট জাতি হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রকাশ করে ও সগর্বে তাদের বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্যের বাহক হয় তাদের কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

লক্ষ্মী মেনন

বঙ্গদেশ

॥ ১ ॥

কারো কথা বলতে গেলে প্রথমেই তার দানের হিসাবে প্রবৃত্ত হতে বিশেষ ইচ্ছা হয়। সে দিক দিয়ে যদিও বাংলার জীবনযাত্রা রৌদ্রদগ্ধ বিবর্ণ পাতার মতো শ্রীহীন হয়ে পড়েছে, তবুও তার দেবার আছে অনেক কিছু। এটা অনেকটা একজনের হয়ে ওকালতি করার মতো শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু বাঙালীর জীবনধারা এতই বৃহৎ ও জটিল যে, সে কারো ওকালতির অপেক্ষা রাখে না। যে কোন পরীক্ষায় এ সত্য সর্বদাই প্রমাণিত হবে।

বাংলা দেশে অতি অল্প লোকই আছে যারা উপলব্ধি করে, বাংলা দেশের বাইরে জাতিভেদ প্রথা কিরূপ প্রবল ও কার্যকরীরূপে প্রকট। জাতিভেদ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্রোক্তি তাই বাঙালী মনে কোন সাড়া জাগায় না, কারণ বাংলার রাজনীতিতে জাতিভেদ প্রথার কোন প্রভাব নেই। রাজনীতিই বাঙালী জীবনের প্রতিটি স্তরেই কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং বাংলা দেশে রাজনীতি যখন জাতিবৈষম্যকে মূল শক্তি হিসাবে স্থান দেয় না, তখন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা ও জনসাধারণের আচরণে তার প্রভাব থাকা কখনই সম্ভবপর নয়। বাংলা দেশ জাতিভেদ প্রথা থেকে নিজেকে বহুদিন পূর্বেই মুক্ত করেছে এবং অন্যান্য বহু প্রভাব এর স্থান অধিকার করেছে। এই প্রভাবগুলি অধিকতর আধুনিক এবং অতীতের মূল শিকড়ের রস আহরণ করতে কম উদ্যমশীল।

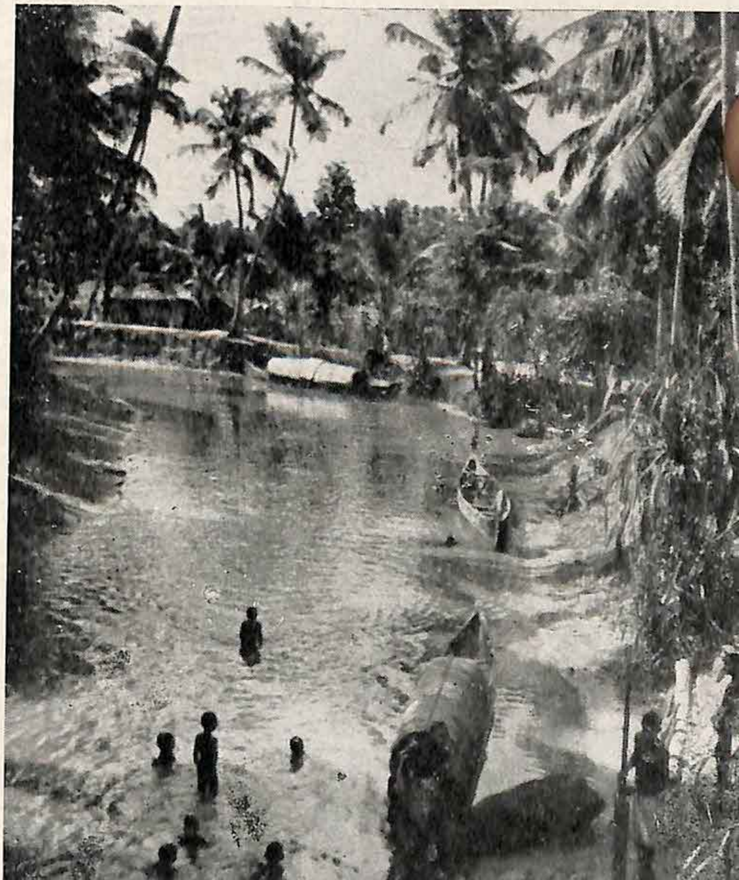
এর কারণ সম্ভবতঃ বাঙালীর ধমনীতে মিশ্র রক্ত প্রবাহিত,—কোন একটি বিশেষ ধারায় তা প্রভাবান্বিত নয়। ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার (Francis Bernier) তিনশো বছর পূর্বে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাংলা দেশে প্রবেশ করবার শত দ্বার উন্মুক্ত আছে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের জন্যে একটি দ্বারও খোলা নেই। বাংলা দেশ সম্পর্কে বার্ণিয়ায়ের এই উক্তি যেমন শত শত বৎসর পূর্বেও প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য বর্তমান কালেও। জাতির পর জাতি স্থলপথে ও জলপথে এসে একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে এ দেশকে বিভক্ত করেছে, আবার ঐক্যবদ্ধও করেছে ; শত শত পুষ্প এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং বহু চিন্তাধারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। গাঙ্গেয় উপকূলভাগে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য এবং বাংলার উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন ধর্ম বহুবার অপকৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে মিতালি করেছে এই মনে করে যে, নতি-স্বীকারের দ্বারা জয়লাভ করার মধ্যেই আছে সাহসের চরম পরাকাষ্ঠা আর তার ফলে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। ধর্মের

উন্মাদনা বাংলার দ্বারে এসে প্রশমিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে এবং পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাংলা দেশে নানা অদ্ভুত ধর্মের নির্বিরোধ সংমিশ্রণ ঘটেছে। বহু শতাব্দী ধরে বাংলা দেশ অসহযোগ আন্দোলনের ও বহু বিপজ্জনক বিপ্লবী চিন্তাধারার আশ্রয়স্থল হয়েছে। বাংলা দেশ সকল সময়েই স্বতন্ত্র; কারণ এক সময়ে সে ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। আবার অন্য সময়ে দেখা যায় যে, বাংলা দেশ অপরের সঙ্গে মিশেছিল বেশী, জেনেছিল বেশী এবং ত্যাগস্বীকারও করেছিল বেশী। এই স্বাতন্ত্র্য বাংলা দেশে লেগেই আছে কখনও তার সম্মানের রূপে, কখনও বা অভিশাপের রূপে। কিন্তু সে এ ব্যাপারে নিরুপায়। বহুদিন ধরে এইটিই তার ভাগ্যে চলে আসছে এবং আজ যদি সে ভারতের জাতীয় জীবনে বাত্যাক্ষুব্ধ বিহঙ্গের অবস্থায় পড়ে থাকে, তাহলেও সে এর অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ; কারণ সে এখনও বিশেষভাবে এই উপ-মহা-দেশের উপর প্রভাববিস্তার করে এবং তার জীবনধারা ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

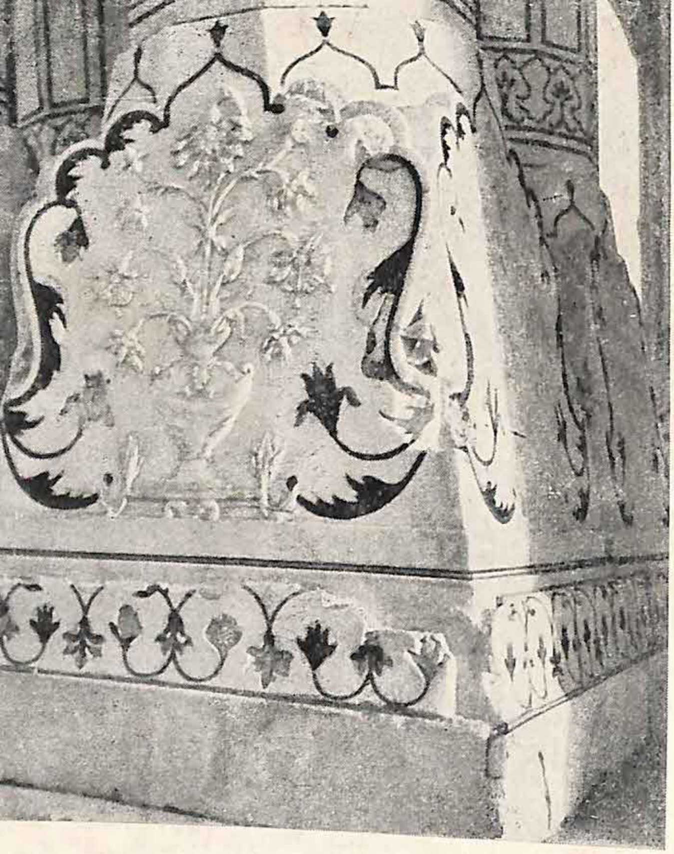
বার বার বাংলার জীবনে এটা ঘটেছে। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা দেশে একটা অসামঞ্জস্য, উন্মার্গতা এবং অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ দিক সব কিছুকেই গ্রাস করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বার্ণিয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে, কৃষির দিক দিয়ে মিশরকে যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং ফলপ্রসূ দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, তার মূলে আছে বাংলা দেশ। কিন্তু তাঁর কালেই বাংলা দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং হুগলী বন্দর ভারতবর্ষের সমগ্র বাণিজ্যের অর্ধাংশের অধিক পরিচালনা করত। কৃষির উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে অগণিত বিদেশী শক্তি বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তারই ফলে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে বাংলা দেশ বৈপ্লবিক রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অর্থনীতিগত উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলা দেশে চেতনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তীক্ষ্ণ করেছিল, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এনেছিল, চিন্তার বাধাসমূহকে অপসারিত করেছিল এবং একটা সাহসিকতা ও মেলামেশার ভাব উদ্দীপ্ত করেছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে হুগলী বন্দরের অভ্যুত্থান ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে আধুনিক শহুরে জীবন গড়ে তুলেছিল, এবং তারই ফলে কলকাতা অস্বাভাবিকরূপে প্রসারিত হয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার এই প্রসারতা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি সামঞ্জস্যহীন—অনেকটা হৃদয়-স্ফীতি ব্যাধির মতো; কারণ কলকাতা কেবলমাত্র বাংলারই



মুসৌরী থেকে উত্তর প্রদেশে আগত একজন খাঁটী পাহাড়ী। তাম্রবর্ণ এবং স্বাস্থ্যবান, মিষ্টস্বভাষী ও পরিশ্রমী পাহাড়ীরা পাহাড়ের উপরে এবং নিম্নস্থ উপত্যকায় তাদের পৃষ্ঠদেশের সম-লম্বমান ঝুড়িতে কাঠ ও কয়লা পরিষ্কারভাবে সাজিয়ে বহে নিয়ে যায়



ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কেরালার একটি তুলনামূলক সৌন্দর্যের দৃশ্য। কেরালা সম্বন্ধে প্রথম মনোভাব এবং স্থায়ী মনোভাব— সবুজের সমারোহ, যা খালের তীরস্থিত সঞ্চরণ-শীল তাল ও ফার্ণ বৃক্ষের দ্বারা পুষ্ট



আগ্রা ফতেপুর সিক্রির উত্তরাঞ্চলীয়
অলঙ্কৃত নক্সা-খোদিত সৌন্দর্য



ভারত নাট্যকলার দক্ষিণী রূপ

কেন্দ্রস্থল নয়—সমগ্র পূর্ব-ভারতেরও। বাংলার সাম্য আর একবার ব্যাহত হয়েছিল যখন কলকাতার শহরগুলির লোকসংখ্যা ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় বৃদ্ধিলাভ করেছিল এবং সেই জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করায় দেশে স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ফলে, গ্রামের ব্যবসায়াদিতে অর্থবিনিয়োগের অভাব ঘটেছিল, কারণ সব দিক দিয়ে প্রধান এই যে কলিকাতা মহানগরী, এ শুধু যে দেশের অর্থকেই গ্রাস করেছিল তা নয়, এমন কি মেধা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাকেও আত্মসাৎ করেছিল। এই সন্ধিক্ষণেই বাংলাদেশে এল দীর্ঘদিন ব্যাপী রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা, কর্মচাঞ্চল্য, দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগ, এবং এই শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা গেল সংস্থানের চেয়ে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এদের অধিকাংশই বেকার, গৃহহীন, সহায়হীন আর এদের টাকাকড়িও পরহস্তগত।

সমগ্র বাংলার মধ্যে কলকাতার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, আমার মনে হয়, আমাদের জীবনধারারই প্রতীক। শহর ও গ্রামের মধ্যে যে ব্যবধান সেটাই আমাদের জীবনের উপর একটা সুনির্দিষ্ট ছাপ রেখে দিয়েছে। একমাত্র সম্ভবতঃ বোম্বাই শহর ছাড়া, ভারতবর্ষে কলকাতাই হচ্ছে একটিমাত্র শহর যেখানে নাম-মাহাত্ম্যের কোন বালাই নেই। এখানে চাকরির পদমর্যাদার ঔদ্ধত্যের স্থান নেই এবং অতি সাধারণ মানুষও তার আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পারে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সে কারো খিদমতগার তো নয়ই, নয়া দিল্লীর দাসের দাসও নয়। সে যা সে তাই—সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সে প্রায়ই প্রয়োজনের অধিক নিজের মূল্য নির্ধারণ করে ; বিশেষভাবে যখন সে কোন শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করে বা সরকারের গতিবিধির প্রতিরোধ করে বা সাধারণ সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে, যার জন্যে, একটা উদ্ভট মনোবৃত্তিবশতঃ, সে সরকারী শক্তিকে নিজের উপর আরোপ করে এবং তার প্রতিরূপ স্বরূপ নিজেকে বিবেচনা করে। দীর্ঘকালের অমানুষিক নোংরা পরিবেশের বদ্ধ জাবনে থেকে সম্ভবতঃ এটাই তার বাতাস গ্রহণ ও গলার চারিপাশের ফাঁস আলগা করার বিশেষ রীতি। তার চতুষ্পার্শ্বে যা ঘটছে সে বিষয়ে কিন্তু সে সচেতন, প্রভুত্বের কথাতেই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তর্জন করে সে গর্জনকে থামায়, কিন্তু হায়! প্রায়ই সে নিজেই শেষ পর্যন্ত তর্জনগর্জনকারীতে পরিণত হয়। জ্ঞানের সাহায্যে সে তার দুঃখকষ্টের প্রতিকার করতে সচেষ্ট থাকে ; তার রুদ্ধবেদনা, আলোহীন, জলহীন, কর্মহীন, ক্ষুধা ও মোহময় অবস্থাকে সে পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা, গান-শোনা, লেখালিখি এবং পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে যে শক্তির খেলা চলেছে স্মৃতিতে তাকে রোমন্থন করে উন্নত করতে চায়, ফলে তার চেতনা কখনও জিজ্ঞাসায়

কখনও আত্মাবমাননায় ধারালো হয়ে ওঠে, কখনও কখনও আবার যে দেশের উপর সে প্রভুত্ব করতে চায় বা প্রভাব বিস্তার করতে চায় তার সংস্পর্শই হারিয়ে ফেলে। বুভুক্ষা, কর্মহীনতা, বাসগৃহের অভাব, সন্তান-সন্ততিদের ও নিজের শিক্ষার অভাবজনিত গভীর মর্মান্তিক বেদনার সংগ্রাম করতে তার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, ফলে সে অনেক সময় ভুলে যায় ১৯৪৭ সাল থেকে তার দেশ কতদূর এগিয়ে চলেছে, সে ভুলে যায় যে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করার দায়িত্ব তার ছিল। কিন্তু সেজন্যে তাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে তার নিজের শহরে পরিকল্পনার অতি সামান্যই ভোগ করেছে—আসলে, এটা তার দৃষ্টিহীনতারই পরিচয়। সে নিজের গ্রাম ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও যেতে চায় না এই ভয়ে যে, সে তার গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক হারাবে, কারণ এর মধ্যেই রাজনীতির দিক দিয়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থের ক্ষেত্রে একটা দ্বৈতবোধ জেগেছে।

আমাদের সময়কার একজন বিখ্যাত শেক্সপীয়রের সমালোচক 'হ্যামলেট' নাটক সম্পর্কে বলেছেন যে, এর প্রধান ত্রুটি হচ্ছে ভাবাবেগের তুলনায় ঘটনার অভাব ; মানুষ হ্যামলেট অবর্ণনীয় ভাবাবেগের প্রাধান্যে প্রভাবিত, কারণ ঘটনা যা ঘটেছে তার তুলনায় ভাবাবেগের প্রাচুর্যই লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের বর্তমান জীবনধারার মধ্যেও ঐ একই লক্ষণ দেখা যায় : বাংলা দেশ আজ যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছে সে তুলনায় তার আবেগ ও বুদ্ধি অনেক বেশী, একাধারে সে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, অন্য দিকে সে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও ক্ষীণদেহ। প্রাণোদ্দীপক পূর্ববঙ্গ থেকে সে আজ বিচ্ছিন্ন, তার অনুভূতি সূক্ষ্ম মার্জিত রুচির পর্যায়-ভুক্ত, কিন্তু জীবনধারণের সমস্যা সমাধানে সে আজ অপারগ। সে নিশ্চয়ই নিজের জাবনকে ব্যর্থ মনে করে, যেহেতু তার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সঙ্গে তার বহির্জীবনের কর্মধারার কোন যোগসূত্র নেই। শেক্সপীয়রের সমালোচকের কথায় আবার বলতে গেলে বলতে হয়, তার জীবনযাপন-প্রণালীর জন্যে তার মধ্যে যে অসন্তোষের উদ্রেক হয়, তার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তার জীবনযাপনের ধারা তার সেই বিরক্তিকে অপসারিত করতে সমর্থ হয় না। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি যা সে উপলব্ধি করতে পারে না, যাকে সে বাস্তব রূপ দিতে পারে না, এবং সেই কারণে এটাই তার জীবনকে বিষময় ক'রে তোলে এবং তার কর্মশক্তিকে ব্যাহত করে। কোন সম্ভাব্য কর্মই তাকে খুশী করতে পারে না এবং তাকে ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকতেই হবে, কবে সে তার এই লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভ করবে।

অশোক মিত্র

॥ ২ ॥

'কালচারাল ফোরাম'-এর মার্চ সংখ্যায় বাংলার জীবনযাত্রা সম্পর্কে শ্রীঅশোক মিত্রের মন্তব্য প্রাণবন্ত হয়েছে। তাঁর এই চিন্তায় কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না, যেহেতু তিনি সেই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে এড়িয়ে যাননি, যেগুলি সাধারণতঃ এই সমস্যার আলোচনায় উপস্থিত হয়। বাইরের জীবনধারা ও আত্মিক অনুভূতির মধ্যে বৈষম্যের ফলে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে। দুই বা ততোধিক শতাব্দীকাল মাকড়শার জালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের অবস্থা আজ চরমে উঠেছে। সে ভারতীয় মঞ্চে জরাগ্রস্ত অশ্বের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সে হতভম্ব ও অবসাদগ্রস্ত। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তার মধ্যে একটা আস্ফালনের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে এবং তার মনে হয়, তার গুণের তুলনায় পৃথিবীটা হয় খুব বড়, না হয় খুব ছোট।

মেকলে যাকে ভাবপ্রবণ আচরণ বলে জাহির ক'রে আনন্দলাভ করেছেন, এটা তা নয়, এটা প্রকৃতই বাংলার জীবনধারার উপর একটা সত্যিকার বোঝা যা কিছুতেই হ্রাস পায়নি। কলকাতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অসামঞ্জস্য এনেছে ; এই অসামঞ্জস্য দেশবিভাগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং এখনও পর্যন্ত, যদি বাংলা দেশ বিশেষ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবে গণ্য করতে হবে, যেহেতু ইতিহাসে দেখা যায়—বিপ্লবের এমন একটি দিক আছে যে সে তার প্রধান অগ্রণী ও মুক্তিসৈন্যদের পরিত্যাগ করে এবং তাদের বিশ্বস্ত অনুগামীদের দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করে।

এটা সত্য যে এই সব কারণে বহির্জগতের সঙ্গে বাঙালীর সম্বন্ধ অনেকখানি তিক্ত হয়ে পড়েছে। যদিও বাহ্যতঃ সে খুব উগ্র ও অনমনীয় কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, তার এই চিন্তার স্থিতিস্থাপকতার মূলে আছে তার গভীর ঐতিহাসিক ভাবসম্পদ। অশোক মিত্র বলেছেন, ধর্মান্দোলনের উগ্রতা বাংলার মাটিতে এসে বহুল পরিমাণে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল ; কারণ এই বাংলা দেশের জীবনধারার প্রধান বিশেষত্ব ছিল, এর সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক মনোভাব। এই মতবাদ সাধারণ বাঙালী জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে ; বিশেষ

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই বৈশিষ্ট্য সমন্বয় ও সংহতি ধারার সঙ্গে খাপ খায় না।

বাংলার জন্মগত ভাবধারার মূল কথা হচ্ছে যে, প্রচলিত ধর্মমত থেকে কিছুটা বিভিন্নতা, জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিকতার প্রাধান্য তার মূল বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দেশই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল না। বস্তুতঃ, বাংলা দেশ কতকগুলি অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পীঠস্থান ছিল। এই সম্প্রদায়গুলি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্রিয়াকর্মের তুলনায় উচ্চতম ধর্ম হিসাবে মানবতার মূল্যের উপর অধিকতর জোর দিয়েছিল। সহজিয়া, নাথ ও বাউলের ন্যায় অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের মধ্যে এই মানবতাবোধ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একজন বাঙালী কবি এই সত্যকে যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যা আর কারুর দ্বারাই সম্ভব হয়নি যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' এটিই মূল সত্য : বাকী সবই তুচ্ছ।

এই মানবতাবোধের প্রভাব এবং ধর্মসম্পর্কে বিরোধীদের ন্যায়-শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্ক ব্যক্তি-মর্যাদা ও জাতিগত ঐক্যের ধারণাকে বলবন্ত করেছিল ; এমন কি বহির্জগতের বৃহত্তর স্তরে জনসাধারণের আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অতীতে সকল সময়েই বাংলাদেশ বিরোধী ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছে এবং যা কিছু ক্ষমতাব্যঞ্জক তা তৎক্ষণাৎ তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলা দেশ যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিল উত্তরাঞ্চলের হর্ষবর্ধন, বলবন ও আকবর প্রমুখ সাম্রাজ্যস্থাপনকারীদের, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষভাবে হেষ্টিংস ও কার্জনকে এবং পরবর্তীকালে নয়া দিল্লীর শ্বেত মুঘলদের। পরিবেশ আজ বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু বাঙালী মনের এই আবর্তন এখনও সমানভাবে চলেছে এবং নূতন ধারাকে সে যে সহজে গ্রহণ করতে পারবে সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

কোন কোন ব্যক্তির কাছে এটা দৃষ্টিহীনতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাঙালী চরিত্রের এই যুগপৎ বিপরীতধর্মী গুণগুলির অবস্থান তার মননশীলতারই পরিচায়ক। ঘটনামূলক ও ধ্বংসমূলক এই উভয় বৈশিষ্ট্যই তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দেখা যায়। সে তার নিজের পরিকল্পিত বস্তুকে নষ্ট করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না যদি সে দেখে যে সেটি যথোপযুক্ত হয়নি। মেজাজের দিক দিয়ে সে বামপন্থী এবং দুর্দমনীয় তার হৃদয়াবেগ, 'অনুপযুক্ত স্ত্রী'র সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করার চেয়ে 'নতুনের সন্ধানে উদ্যোগী হতে' সে অভিলাষী। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে এই অসঙ্গতি তার স্নায়ুকে পীড়ন করে এবং

তা 'অজ্ঞাত বিশ্বকে' জানবার প্রেরণা যোগায়।

ঠিক একই ভাবে বলা যায় যে, তার ভাবাবেগের একটা যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি আছে। কারণ, সে নীতিগত ভালোমন্দের কথা জোরের সঙ্গে চিন্তা করতে পারে ; ফলে যেখানেই সে অসামান্য ও অন্যায় কিছু দেখে, সেখানেই সে স্পর্শকাতর হয় ; কিন্তু বর্তমানের এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে সে যদি বিশেষভাবে সাবধানী ও উদ্যোগপরায়ণ না হয়, তাহলে তার মনুষ্যজীবনে হীনতা এসে যাবে। আবার আঞ্চলিকতা-বোধ কেবল তার বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে এবং তা উচ্চতর মননশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে কার্যকর হয়। তার কাছে দেশপ্রেম ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং যদিও সে কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক তাহলেও তার হৃদয় জাতীয়তা ও সার্বজনীনতার উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করে। ধর্মের বিষয়ে সে অনুসন্ধিৎসু ও সন্দেহবাদী এবং সকল প্রকার যুক্তিসম্মত দাবী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী উদার, তথাপি তার মন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী এবং সে নানা উৎসব-আনন্দে মাতামাতি করতে দ্বিধাবোধ করে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর এবং ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত প্রথম নগর এই কলিকাতার প্রসারতা বাঙালীর জীবনধারার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে মানবীয় মূল্য ও মানের নানা খুঁটিনাটির প্রতি সূক্ষ্ম চেতনা এবং পরিণত নাগরিক সংস্কৃতির অতি সূক্ষ্মতম দিকেও তার সজাগ দৃষ্টি। যা কিছু স্থূল ও সাধারণ তার প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঘৃণা জাগে। একজন বাঙালী তার প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন করতে যদিও সঙ্কোচ বোধ করে না, তবুও সাধারণভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী তীক্ষ্ণ এবং তার রুচি ও চালচলন নিখুঁতভাবে মার্জিত। কান্তি-সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্নিগ্ধ ভাবভঙ্গী, কোমল সুরলহরী ও সূক্ষ্ম খোদাইকর্ম প্রকাশ ক'রে সে আনন্দ পায় ; তার সাহিত্যপ্রীতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে কমনীয়তা ও মোহনীয়তার অত্যুৎকর্ষ এবং সত্য ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতর গভীরতাকে লাভ করতে সচেষ্ট তার সহজাত গুণ।

এস. বি. চৌধুরী

মাদ্রাজ

মাদ্রাজের (তামিলনাদ) জীবনধারার যে বৈশিষ্ট্য তা প্রকৃতি ও তার সাংস্কৃতিগত চারিত্রিক গুণাবলীর দানস্বরূপ। মাদ্রাজের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় তাকে প্রচণ্ড উষ্ণ, শীতল বা আর্দ্রতাপূর্ণ আবহাওয়া ভোগ করতে হয় না। উভয় প্রকার মৌসুমী বায়ুর সুফল মাদ্রাজ ভোগ করে, এবং সাধারণতঃ সিক্ত, শুষ্ক ও বাগান জমি থেকে যে শস্য উৎপন্ন হয় তা নিয়মিত ও যথেষ্ট, যদিও তা অতিরিক্ত নয়। এই উপ-মহাদেশের ঔপদ্বীপ অঞ্চলে তার নিরাপদ অবস্থানের ফলে সে এমনই একটা সুরক্ষিত একাকীত্ব ভোগ করে যার জন্যে সে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সামরিক আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বেশী রক্ষা করতে পেরেছে। তামিলনাদের এই ভৌগোলিক পরিস্থিতি তাকে বহু বড় আঘাত থেকে রক্ষা করেছে এবং তার মহান্ ঐতিহ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। হিন্দুত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ হে বিজয়নগর তোমাকে অভিনন্দন জানাই, কারণ তুমিই বিজয়ী ইসলামের অগ্রগতি রোধ করেছ এবং এমন একটি ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছ, যা নতুন ও পুরাতন আদর্শের সুসমন্বয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

তামিল সংস্কৃতির নব-চেতনার কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী সানন্দে তামিলনাদের অতীত ঐতিহ্যের গান গেয়েছেন, সে গানের বাণী আজ বিদ্যালয়ের ছোট ছেলে, পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের কণ্ঠে নিনাদিত। আর্য এবং আর্য-পূর্বদের তাৎপর্যপূর্ণ সংমিশ্রণের অন্যতম সুফল হচ্ছে তার এই ঐতিহ্য, এবং তার জীবনের বিচিত্র কলাসম্পদ কোন্ এক স্মরণাতীত অতীত থেকে চলে আসছে এবং তার বর্তমান জীবনধারাকেও প্রভাবান্বিত করেছে। সে তার মৌলশক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছে এবং সেই সঙ্গে বাইরের শক্তি থেকে যা নূতন পেয়েছে তাকে সুষ্ঠুভাবে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

সংস্কৃত ভাষার পরেই ভারতীয় ভাষার মধ্যে তামিলই হচ্ছে সর্বপ্রাচীন ভাষা এবং এই ভাষার সাহিত্যিক পরম্পরা সেই খৃষ্টীয় যুগের সূচনা কি তার পূর্ব থেকেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে দেখা যায়। তামিলনাদের অতীত ঐতিহ্যকে তিনটি উল্লেখযোগ্য যুগে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে তামিল ভাষাও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রণী হিসাবে কাজ করেছে এবং সেই স্বাধীনতার উদ্দীপন থেকে নূতন শক্তি সঞ্চয় করেছে। প্রথম পর্বের 'সঙ্গম' গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন বহুদিন বিস্মৃতির পরে আজ আবার নবপ্রাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমান তামিলবাসীদের আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীর

উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুত্বের সুবর্ণময় যুগ। এই যুগে ভক্তিমূলক সাহিত্যের প্রসার বিশেষভাবে স্মরণীয়, যা আজও জীবন্ত হয়ে আছে এবং মন্দিরে-মন্দিরে গীত হচ্ছে, বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হচ্ছে, ঐকবাদ্যে ঝংকৃত হচ্ছে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রচারিত হচ্ছে। এই নবজাগরণের ফলে বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত এক ঐশ্বর্যময় মন্দির-সম্পদ লভ্য হয়েছে, যা স্থাপত্য ও চিত্রকলার অনুপম নিদর্শনরূপে নানাভাবে ভক্ত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। সর্বশেষ যুগে তামিল কৃতিত্ব সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল, পূর্ব-সংস্কৃতির রেশ টেনে নূতন সৃষ্টি করতে সে সক্ষম হয়েছিল। আচার্যেরা এই সময়ে পদ্ধতিমূলক দর্শনের প্রচারে যত্নবান হয়েছিলেন, এবং ভাষ্যকারগণ তার সূত্রসকল বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের জন্যে সেই সকল ভাষ্যকারদের কাছে আমরা ঋণী। সেই সকল সূক্ষ্ম যুক্তির দক্ষতা আজও বিভিন্ন মঠ পরিচালিত সাধারণ তর্কবিতর্কের সভায় (সদস্) দেখা যায় এবং কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত রাজদরবারের (মহীশূর, পুহুকোটা, কোচিন প্রভৃতি স্থান) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

তামিলদের এই শিল্পৈশ্বর্য আধুনিক কালে অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যেও বড় কম প্রভাব বিস্তার করেনি। 'এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চারিটি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে অধুনা মাদ্রাজে, যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ ও নর্তক-নর্তকীরা সমবেত হয়েছে, সেখানে যে ভারতনাট্যম্ প্রচলিত তা ভারতের মধ্যে সর্বোত্তম। এমন কি এর বর্তমান পদ্ধতির মধ্যেও পুরাতন ধারা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং যে কোন প্রচলিত চিরায়ত কলার মধ্যে সর্বপ্রাচীন সুবিন্যস্ত পদ্ধতি।' এই দাবীর সমর্থনে আমাদের শুধু এর আধুনিক শিল্পকুশলীদের কথা স্মরণ করলেই হবে। বালাসরস্বতী বহুদিন যাবৎ অভিনয় শিল্পে তাঁর কুশলতা ও মৌলিকতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করে আসছেন। অন্যান্য তরুণ শিল্পীদের মধ্যে কমলা লক্ষ্মণ এবং বৈজয়ন্তীমালার যশ ও খ্যাতি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মুখর হয়ে উঠেছে।

গীত-বাদ্যের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির জন্যে তামিলেরা ভূয়সী প্রশংসালাভ করে থাকেন। বাওআর্স বলেছেন, 'মাদ্রাজের কোন হোটেলের পরিচারক অজ্ঞাত রাগ-বিশিষ্ট একটি প্রার্থনা-সংগীত শুধু যে গাইতে পারে তা নয়, সে একটি জটিল তাল ও সংগীতের ছন্দ টেবিলের উপর পরিবেশন করতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ দেশের শ্রোতারা সর্বাপেক্ষা বিচারশীল সমালোচক।' সংগীতের বিখ্যাত ত্রিরূপের আবাসস্থল হচ্ছে তামিলনাদ এবং কর্নাটক সংগীতের সমৃদ্ধি ও সূক্ষ্মতা বহু বিদেশী পরিব্রাজককে বিস্মিত করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত সংগীত-বিজ্ঞানী রুথ ডগলাস

১৯৫৭ সালে বলেছেন, 'গত সোমবার সংগীত অ্যাকাডেমিতে বীণার সৌন্দর্য, বাঁশীর অনিন্দ্যতা, ভেঁপু যন্ত্রের সার্থকতা, মৃদঙ্গের মাত্রা-নির্ভুলতা, কণ্ঠের সাবলীলতা, আকস্মিক সংগীত-রচনার সূক্ষ্মতা এবং প্রকাশের গভীরতা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি।' এবং বিখ্যাত আমেরিকান সংগীত রচয়িতা হেন্‌রি কাওয়েল তাঁর 'ত্রয়োদশ ঐকতান' মাদ্রাজকে উৎসর্গ করেছেন; দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের দর্শন ও কলাকুশলতাকে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের কাঠামোয় আনবার এটা একটা অভিনব প্রচেষ্টা। ভারতী তামিল-নাদকে ভারতবর্ষের বৈদিকভূমি বলেছেন। বৈদিক স্তোত্রগুলি সম্পর্কে তার ঐতিহ্যের গরিমা তাদের শুদ্ধতার মতই মহান্‌। বৈদিক সংস্কৃতির কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই তামিল বেদজ্ঞদের স্তোত্র পাঠ না শুনে পারে না, যদি সে প্রকৃতই সেই সংস্কৃতির অর্থ একান্ত-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়।

প্রকৃতি তামিলদের যে সংযমতায় ও বিধিবদ্ধতায় ভূষিত করেছে তা তাদের দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিভাত হয়। তাদের বিবেচনাশক্তি অত্যন্ত মধুর এবং কোন উগ্র ভাবাবেগ তাদের বিচলিত করতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনায় যদিও তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাদ-বিসম্বাদ ঘটে, তত্রাচ তা কখনও প্রত্যক্ষ মারামারিতে পরিণত হয় না। এই জন্যেই সম্ভবতঃ তামিলনাদের বিদ্যালয়সমূহে ও খেলার মাঠে সুষ্ঠু আবহাওয়া লক্ষিত হয়, যেটা অন্যত্র বাধাপ্রাপ্ত হয় 'ছাত্র বিশৃঙ্খলা' নামে অভিহিত হয়ে। তামিলেরা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা পছন্দ করে না। চাতুর্য ও বুদ্ধির জন্যে তাদের এই মূল্য দিতে হয়। তামিলবাসীরা অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মিশুক জাতি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষণ-ব্যবস্থার উচ্চমানের জন্যে বিখ্যাত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ন্যায় বহু কৃতী রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ও অপরাপর শিল্পে পারদর্শীদের সৃষ্টি করে তাদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তামিলনাদ যে প্রাচীন সংরক্ষণশীলতায় অন্ধভাবে বদ্ধ নয় তা বহু দিক দিয়ে প্রমাণ করা যায়। একদিকে, সেদিন পর্যন্ত শ্রীরামণ অরুণাচল পাহাড়ের শিখর-দেশ থেকে প্রাচীন অদ্বৈতবাদকে আধুনিকরূপে প্রচার করেছিলেন এবং বিশ্বের সর্বত্র থেকে সে প্রচারের সাড়া পেয়েছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠগুলি কালের দাবীকে আজ মেনে নিয়ে একত্র হয়ে হিন্দুধর্মকে পুনর্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে এবং প্রচারের জন্যে যুক্ত আবেদন জানাচ্ছে। অন্য দিকে, পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জীবনধারার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এখানে এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র তার অন্যান্য কাজের মধ্যে বিশ্বজনীন সংস্কৃতি ও আমাদের

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছে।

তামিলনাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে ভারতীর দেশাত্মবোধক দাবী ভ্রমাত্মক নয় ; এর প্রমাণে উদার মতাবলম্বী মাদ্রাজের রাজ্যপালের (শ্রীশ্রীপ্রকাশ, যিনি নিজে তামিল নন, যিনি এখন বোম্বাই-এর রাজ্যপাল) প্রশংসাসূচক অভিমত প্রণিধানযোগ্য— 'প্রাচীন ভারতবর্ষ আজ যদি কোথাও সজীব থেকে থাকে তবে তা তামিলনাদে, এবং যদি কেউ ভারতীয় কলা, সংগীত, নাটক ও সাহিত্যের উৎকর্ষ দেখতে চায়, তবে তাকে মাদ্রাজে যেতেই হবে।'

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী

পঞ্জাব

আগন্তুক : 'ওহে পঞ্জাবী, কেমন আছ?'

পঞ্জাবী : 'আমি যেমন থাকতে চাই, তেমনই আছি।'

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপটি, বচনভঙ্গীর সৌষ্ঠবের অভাব সত্ত্বেও, পঞ্জাবী চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যটিকে প্রকাশ করে—এটি হচ্ছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

পঞ্জাবী আর পাঁচজনের মতোই জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতির জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। কোন রাস্তায় বা সাধারণ রাজপথে তাকে একবার দেখ। তুমি দেখতে পাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে গালগল্প করছে। পঞ্জাবী লরি-চালকেরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে বেহিসাবীভাবে গাড়ি চালায়, তা যদিও রাস্তার বেআইনী দিক নয়। উৎফুল্ল চার পাঁচ জন সাইকেল-চালক এক সঙ্গে মিলেমিশে বুক ফুলিয়ে কাঁধ-ধরাধরি করে গোটা রাস্তাটা জুড়ে এগিয়ে চলে এবং দোকানদারেরা রাস্তার উভয় দিকের সরাসরি এক-চতুর্থাংশ জবর-দখল করে অবরোধ সৃষ্টি করে। যদি কেউ এর প্রতিবাদ করে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তর পায়, 'রাস্তা কি তোমার ঠাকুরদা'র?'

এক বালতি বোঝাই নোংরা জল উপর তলা থেকে ঝপাৎ করে পড়ল, যখন কোন বন্ধু রাস্তা দিয়ে চলেছে। যখন সে চীৎকার করে বললে, 'ফেলার সময় দেখে ফেল না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর আসে, 'তুমি দেখে রাস্তা চল না কেন?'

সংক্ষেপে বলা যায়, 'এরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।'

একজন সামরিক মনোরোগ-চিকিৎসকের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করেছিলাম। তাঁর মতে পঞ্জাবীরা স্বকাম-বিকারে (Narcissus-Complex) পূর্ণ। সে নিজের প্রেমে নিজে মাতোয়ারা এবং অপরকে সে নিজ মহিমার দর্শক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

এই মনোবৃত্তিই পঞ্জাবী সৈন্যদের সাহসিকতার মূল কারণ—তারা তাদের নিজেদের গুণের পরিচয় দিতে চায়—এবং এটাই নির্দেশ করে পঞ্জাবীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাদের অত্যুজ্জ্বল পাগ্‌ড়ি এবং তাদের চাল-চলনের চপলতা।

পূর্বোক্ত মনোরোগ-চিকিৎসকের উক্তি পঞ্জাবীদের সম্পর্কে অবশ্য সব কথা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কিসের জন্যে পঞ্জাবীদের এই বিকার ও বৈশিষ্ট্যসমূহ?

ইতিহাসের প্রত্যুষকাল থেকে, এমন কি তার পূর্ব থেকেই, উত্তর ভারতের উর্বর ভূমিতে প্রবেশের জন্যে পঞ্জাবই হয়েছে সংগ্রামক্ষেত্র। আর্য, গ্রীক, পাঠান, মুঘল ও

আফগান সকলকেই পঞ্চনদের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ করে প্রবেশ করতে হয়েছে।

এই সকল বিভিন্ন জাতি পিছনে ফেলে রেখে গেছে তাদের দেহাবয়ব, ভাষা ও সংস্কৃতির নিদর্শন। সেই জন্যে পঞ্জাবী চরিত্রের মূলে আছে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও ফল। জীবনধারণের সংগ্রাম তাই পঞ্জাবীকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে এবং বাঁচবার জন্যে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে।

তার উপর আছে পঞ্জাবের জলবায়ু—দারুণ শীত ও দারুণ গ্রীষ্ম। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়াকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে এবং সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

পঞ্জাবী যে ভালোভাবে বাঁচতে চায় সেটাও এই সকল ঘটনার ফল। বর্তমানই পঞ্জাবী জীবনের বড় কথা। আগেকার দিনে টাকার ষোল আনাই সে খরচা করত এবং এখন উত্তম দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্যবশতঃ সে একশো নয়া পয়সার বেশীই খরচা করে ফেলে।

পঞ্জাবী জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসেছে অংশত; জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের ফলস্বরূপ। সে কেবলমাত্র সযত্নে তার জমি-জমা রক্ষা করতে যে তৎপর তা নয়, সে তার প্রতিবেশীর জমি জবর দখল করতেও কোন সংকোচবোধ করে না।

সুতরাং স্বকাম-বিকারই (Narcissus Complex) পঞ্জাবী মনোবৃত্তির একমাত্র কারণ নয়; যেহেতু তা ইতিহাস, জাতি, অর্থনীতি ও জলবায়ুর ফল হিসাবে গড়ে উঠেছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাকে এক অদ্ভুত ধরনের জেদী মানুষ করে তুলেছে। এটা বিচারসিদ্ধ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আসলে এটা তার ভাবাবেগ, সংস্কার ও ব্যক্তিত্বের ফল। পঞ্জাবী অন্ধভাবে তার দলের মতাবলম্বী, কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে দলের সঙ্গে মেশে না। সুতরাং পঞ্জাবে কোন দূরপ্রসারী পরিকল্পনাযুক্ত বড় রাজনৈতিক দল নেই। রাজনৈতিক দল যা আছে তা ছোট ক্ষুদ্র সমষ্টিবদ্ধ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, পঞ্জাবে সর্বভারতীয় নেতা নেই বললেই হয়।

পঞ্জাব হচ্ছে কৃষক-মালিকানার দেশ। ছোটখাটো নবাব, তালুকদার ও রাজাদের দরবার এখানে অতি সামান্যই আছে। পঞ্জাবের সংস্কৃতি সহজ ও সরল, এই সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি। সুতরাং সুরুচিসম্পন্ন দলীয় আদবকায়দা ও দরবারী বক্তৃতার প্রয়োজন এখানে হয় না। তবুও এখানকার কৃষকের স্বাভাবিক সৌজন্য ও সদাচারের অভাব নেই। তার বাড়িতে সে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং সুখাদ্য ও 'লস্‌সি' (জলযুক্ত মথিত দধি) পরিবেশন ক'রে আনন্দলাভ করে। একমাত্র

শহরেই পঞ্জাবীরা অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ও অপরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

মার্জিত জীবনের সংস্পর্শ থেকে পঞ্জাবী জীবন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তাকে কঠোর জীবনযাপন করতে হয় ; এই কারণে স্বল্পসংখ্যক সংগীতরচয়িতা এবং তথাকথিত চারুশিল্পী ব্যতীত পঞ্জাব আজ পর্যন্ত কোন্ বড় কবি, শিল্পী, লেখক ও দার্শনিক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। শিল্প ও দর্শনের অনুশীলনের জন্যে প্রয়োজন নিরাপত্তা, অবকাশ ও প্রাচুর্য। সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যা সম্ভব হয়েছে, পঞ্জাবে কোন সুরুচিসম্পন্ন নৃত্যকলা ও উচ্চ ধরনের মার্গসংগীত পদ্ধতি গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। সমতলভূমির লোকনৃত্য মল্লযুদ্ধ বলেই গণ্য এবং লোক-সংগীত সহজ ও অতি স্পষ্ট।

পঞ্জাবী ভাষা যার সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কই বেশী তা শব্দসম্পদে দুর্বল এবং তার মধ্যে সূক্ষ্মতার অভাবই দেখা যায়। অতি সূক্ষ্ম শব্দ বা উক্তির জন্যে পঞ্জাবী ভাষাকে পারসীগত উর্দু বা সংস্কৃত থেকে ধার করতে হয়। তা সত্ত্বেও সহজ ও সরল জীবন-যাত্রার পক্ষে পঞ্জাবী ভাষা ভাবব্যঞ্জক ও জোরালো এবং তা বলিষ্ঠ বিশিষ্টার্থক শব্দে পূর্ণ। এই ভাষা সারবান সংক্ষিপ্ত প্রবাদে সমৃদ্ধ, যা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ গালিগালাজের ভাষা হিসাবে এর জুড়ি নেই।

এটাও পঞ্জাবী জীবনের রূঢ়তা ও কাঠিন্যের ফল হতে পারে, যা তাকে রূঢ়ভাষী ক'রে তোলে। সে কারোকে আশ্রয় দেয় না এবং কেউ তা খোঁজেও না। কিন্তু মানুষের সদ্‌গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও যেমন তার দোষত্রুটি থাকতে পারে, তেমনি পঞ্জাবী জীবনে ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যেও বহু সদ্‌গুণাবলী আছে। জাতিগত সংমিশ্রণ, রুক্ষ জলবায়ু (যার জন্যে অযোগ্যের স্থান নেই), সাধারণ কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য, এইসবের জন্যে পঞ্জাব এক কষ্টসহিষ্ণু জাতিকে সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে প্রতিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই পঞ্জাবী এবং ব্যায়ামের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ও এশিয়ার বহু কৃতিত্ব পঞ্জাবীরাই লাভ করেছে। পঞ্জাবীর দৃঢ়তা, সুনিশ্চিত সংকল্প ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্যে, দেশ-বিভাগের ন্যায় ভয়ংকর বিপর্যয় সত্ত্বেও, কোন পঞ্জাবী অসন্তোষ প্রকাশ করেনি বা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেনি। একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের পাশবিক হত্যা, বাস্তুভিটার ধ্বংস, খাদ্যশস্য ও সম্পত্তির বিনাশ, এই সবই পঞ্জাবীরা বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছে।

পঞ্জাবীদের সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। ফলে, পঞ্জাব সৃষ্টি করেছে বহু শাসনকর্তা, সেনাধ্যক্ষ, এঞ্জিনিয়ার ও কুশলী কারিগর। এই সকল কর্মের জন্যে সর্বোপরি প্রয়োজন সাধারণ জ্ঞানের প্রাচুর্য।

এই কার্যকরী সহজ জ্ঞানের জন্যেই সংস্কারের বিভিন্ন পরিকল্পনা, যেমন—

অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, যা স্বামী দয়ানন্দ প্রচার করেছিলেন, তার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে পঞ্জাবে।

পঞ্জাবী জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার দুঃসাহসিক অভিযান-স্পৃহা। এশিয়া ও আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের মানচিত্র খুলে দেখলে দেখা যাবে কি ভাবে পঞ্জাবীরা নিজেদের বিস্তার করেছে। কলম্বো, সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং এবং কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সাংহাই শহর পঞ্জাবী দ্বারপাল ও পুলিসে পরিপূর্ণ ছিল। সুদূর ভ্যানকুভার ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় পর্যন্ত পঞ্জাবী কৃষকদের দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি তারা অষ্ট্রেলিয়া, বোর্ণিও এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও অভিযান চালিয়েছে।

এই অভিযানেচ্ছু মনোবৃত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পঞ্জাব রাজ্যকে স্বল্পায়তন শিল্পক্ষেত্রের পীঠস্থান করে তুলেছে। লুধিয়ানা, জলন্ধর, বাটাল ও শোনপাত বাই-সাইকেল, সেলাই-কল, ক্রীড়া সামগ্রী ও কৃষিযন্ত্র শিল্পের জন্যে বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি আমার একজন বন্ধু তাঁর আমেরিকায় প্রস্তুত একটি শস্য-মাড়াই দণ্ড পঞ্জাবে মেরামত করতে পাঠিয়েছিলেন। ছোট্ট একটি কারিগরী সংস্থা কেবলমাত্র সেটিকে মেরামতই করেনি, তার অনুরূপ একটিকে তৈরি করেও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

প্রাণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে কৌতুকপ্রিয়তা আসে। পঞ্জাবী হাসতে জানে, কারো অস্বাভাবিক কিছু দেখলে তাকে সে নির্মমভাবে তিরস্কার করে, এই কারণেই 'ভাণ্ডস্' ও 'নাকলস' এখানে প্রসারলাভ করেছে।

জীবনকে যারা ভালোবাসে তাদের পক্ষে রোমান্টিক হওয়াই স্বাভাবিক এবং এর জন্যে পঞ্জাবীরাও রোম্যান্টিক। 'হির-রঞ্জা', 'শশি-পুন্নু', 'সোহনি-মহিবাল' পঞ্জাবের চিরায়ত রোম্যান্টিক কাব্য, এবং তা আবৃত্তি করা হলে তারা আগ্রহসহকারে শ্রবণ করে। এবং ক্ষণে ক্ষণে তরুণ-তরুণীদের নিয়ে নূতন সংগীত রচিত হয় ও স্থানীয় লোকেরা তা গান করে বেড়ায়।

জি. ডি. সোন্ধী

বিহার

ভারতের 'প্রাণকেন্দ্র' বলে অভিহিত বিহার এমনই একটি রাষ্ট্র যেখানে বহু অদ্ভুত বস্তুর সংমিশ্রণ দেখা যায়। দুরন্ত ও শান্ত নদ-নদী, গভীর ও রহস্য-ঘেরা বনানী, বহু পীঠস্থান ও ইতিহাসের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সংবলিত বিহার ভারতীয় সভ্যতা অনুধাবনের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার। এই রাষ্ট্রে চারটি বিভাগ আছে, যথা পাটনা, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর এবং ত্রিহুত। এদের মধ্যে ছোটনাগপুরের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং এখানে বেশীর ভাগই আদিবাসীরা বসবাস করে। ভারতীয় পুরাণের স্বনামধন্য রাজা জনকের জন্মভূমি ত্রিহুত ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের জন্যে বিখ্যাত এবং আজ পর্যন্ত তা সংস্কৃত ভাষার কেন্দ্রস্থল। ভাগলপুর বিভাগ বিশেষভাবে বাংলার দ্বারা প্রভাবিত। পাটনা ও ত্রিহুতের এক অংশ পূর্ব-উত্তর প্রদেশের সঙ্গে সংলগ্ন এবং উত্তর প্রদেশের নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের মিল আছে।

বিহার গঙ্গার দ্বারা উত্তর-বিহার ও দক্ষিণ-বিহার এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এটি রাজ্যের শাসন বিভাগ থেকে পৃথক। উত্তর-বিহারের কোন কোন অংশে প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে এই অংশের ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বিহারে নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—তাদের মধ্যে হোলি ও ছথ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হোলি বিক্রম-সংবতের প্রথম দিন এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নানা প্রকার আনন্দোৎসব বিজড়িত। শহরে এই উৎসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে কখনও কখনও অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা সংযমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ছথ পূজা প্রাচীন মগধীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের উপাস্য দেবতা হচ্ছেন সূর্যদেব। এর অন্তরালে আছে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা বা মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা! ষষ্ঠ দিবসে অস্তগামী সূর্য এবং কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথিতে উদীয়মান সূর্য পূজিত হয়ে থাকেন।

দুর্গাপূজা, যা বাংলা দেশে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, চল্লিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বিহারে তার কোন মূল্য ছিল না। অধুনা দুর্গাপূজা বিহারের প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মাচরণ যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে বিস্তার লাভ করেছে এটি তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পুরাকালে বিহার বহু সমাজ-সংস্কারক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। পৌরাণিক

যুগে মিথিলার রাজা জনক খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, কিন্তু লোভী ছিলেন না—তিনি অপরাধকেই ঘৃণা করতেন কিন্তু অপরাধীকে ঘৃণা করতেন না ; তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন কিন্তু পাপীদের ঘৃণা করতেন না। চিরকাল তিনি যেরূপ আদর্শ গৃহী হিসাবে পূজিত হয়েছেন, আজও সেইরূপ পূজিত হয়ে থাকেন। গৌতম বুদ্ধ বিহারের গয়া প্রদেশে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ধর্মবিস্তারের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি এমন কতকগুলি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা মানবতার দিক দিয়ে আজও বিশেষ গৌরবের বস্তু। যাই হোক, বাংলা দেশে ব্রাহ্ম-সমাজ এবং পঞ্জাবে আর্য-সমাজের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মতো গত কয়েক বছরের মধ্যে এখানে তেমন কোন আন্দোলন হয়নি। ফলে, বিহারের সংরক্ষণশীল জীবনযাত্রায় তেমন কোন পরিবর্তনও ঘটেনি। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল এর সংরক্ষণশীলতার প্রতি এবং এই লক্ষ্য যদি অনুসৃত হ'ত, তাহলে এই রাষ্ট্রে যখন বহুসংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষালয় আছে, তখন তার সে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিহারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে সামাজিক সংহতির চেয়ে কারুকলা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে অধিক। সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধাচরণের একটা দিক দেখা গেছে যে, বহু পুরুষ ও নারী তাদের জাতি ও সমাজের বাইরে বিবাহ করেছে এবং বহু লোক জাতিবিহীন সমাজে বাস করছে।

বিহার মূলতঃ গ্রামীণ। কেবলমাত্র বর্তমান শতাব্দীতে বিহারে কতকগুলি শিল্পসমৃদ্ধ শহরের পত্তন হয়েছে। শহর ও নগরের অধিকাংশ বিহারীর আকর্ষণ হচ্ছে গ্রামের প্রতি। এই সেদিন পর্যন্ত, যদি কেউ গ্রাম থেকে এসে তার সঞ্চিত অর্থ খাটাতে চাইত, তাহলে সে হয় তার গ্রামে বা গ্রামের নিকটবর্তী জমিদারীতে তা নিয়োগ করত। বিহারের গ্রামবাসীরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে পরম সন্তোষের সঙ্গে। তারা সরল, ধর্মপরায়ণ ও অতিথিবৎসল। ভালোভাবে বাস করবার ধারণা এখনও বিহারের গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের বাদ দিলে, সমবায় মনোবৃত্তি এখনও বিহারীদের মধ্যে বিশেষ গড়ে ওঠেনি। প্রত্যেক বিহারীই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। বিহারের জমিদারেরা খুব শক্তিশালী, তারা জনসাধারণের কাছে খুব প্রিয়। তাদের নেতৃত্ব ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু তাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে এখনও সময় লাগবে।

বিহারের অনগ্রসরণের একটি কারণ হ'ল স্ত্রীশিক্ষার অভাব। এই সেদিন পর্যন্ত কোন বিহারী পরিবারের ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোটা

অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজা এই যে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যেও বিদ্যালয়ে পাঠানো হ'ত না। সম্ভবতঃ এই ঘটনার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, বিহারীদের জীবন বিশেষভাবে গ্রামের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য আজ এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিহারের স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে বিহার প্রতিবেদনশীল এবং মহৎ কর্মসাধনে সক্ষম। স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে সে ১৯২১ সাল থেকে যা করেনি, ১৯৪৭ সালের মধ্যে সে তার সমূহ পূরণ করেছিল। সংহতির জন্যে যে প্রেরণা থাকা উচিত, হয় তার সম্পর্কে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন বোধ করেনি বা সে ভুলবশতঃ ধরে নিয়েছিল এটা স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। ফলে, এই সংহতি যেমন আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্বস্তরেই ঘটছে, তেমনি প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও ঘটছে। কখনও কখনও মন্তব্য করা হয় যে, এই সংহতি যথাসময়ে এবং যথানিয়মে ঘটবে। বিহারের মতো জায়গায় লোকের মনে সংহতির প্রেরণা জাগাবার জন্যে খুব দ্রুত চেষ্টার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই তাকে খুব চিন্তাশীল পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত করতে। কারণ বিহারীরা যে রকম প্রতিবেদনশীল, তাতে কোন পরিকল্পনাই কার্যকর করে তুলতে বেশী সময় লাগবে না।

বি. প্রসাদ

কর্ণাটক

কর্ণাটক দুটি বিশেষ অংশে বিভক্ত ; রাজনৈতিক বিভাগ হিসাবে তা হচ্ছে পুরাতন মহীশূর রাজ্য এবং সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কানাড়া ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি। আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, জাতি-সংস্থা, চিন্তাধারা ও বাচনভঙ্গী অনুসারে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলকে স্পষ্ট ভাগ করা যায়। ভাষার অতি সূক্ষ্ম ঐক্য, এবং একটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অনুগামীরা, যারা এই দুটি অঞ্চলে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার দিক দিয়েও তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাচীন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী পুরাতন মহীশূর রাজ্যের সংস্কৃতি কানাড়া, তেলুগু ও তামিল জীবনধারার সংমিশ্রণে গঠিত। মহীশূর, অন্ধ্র এবং তামিলনাদের মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প একই শ্রেণীভুক্ত। কর্ণাটক সংগীত তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। নৃত্য-জগতে ভারতনাট্যম্ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য।

ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে, তিনটি প্রধান বৈদান্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মাধবাচার্য কানাড়া দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য এখানে একটি মঠ স্থাপন করেন, রামানুজ তাঁর জীবনের বহুলাংশ মহীশূরে নির্বাসিতের ন্যায় অতিবাহিত করেন এবং রাজা স্বয়ং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বেদান্তের তিনটি সম্প্রদায়ের পুষ্টি ও প্রভাবের ধারা কর্ণাটকে অব্যাহত চলে এসেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই জৈনধর্ম এখানে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করেছিল। ধর্মসংস্কারক বাসব কর্ণাটকেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গায়েৎ ধর্ম যা হিন্দু ধর্মেরই ব্যতিক্রম, তা বস্তুতঃ ভক্তিবাদমূলক এবং বর্তমানকালে কর্ণাটকে তাঁর ভক্তসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

কর্ণাটকে মুসলমান প্রভাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হায়দার আলি ও টিপু-সুলতানের রাজত্বকালে উদ্ভূত হয়ে এই দেশ পরম্পরাগত তিনটি মহারাজার দরবারে, মুঘল আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচারের প্রভাব বিস্তার করেছিল। দক্ষিণের আর সকলের মতো হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান উত্তর-ভারতের তুলনায় মনোরম ব্যতিক্রম। বাঙ্গালোরে একটি ইঙ্গ-ভারতীয় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থান এই মহানগরীর সর্বজনীন জীবনযাত্রাকে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

কানাড়া ভাষা দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত। এই ভাষা মালয়ালম ও তেলুগুর অনুরূপ এবং তামিলের মতোই সংস্কৃতের বিরোধী নয়, উপরন্তু সংস্কৃতের প্রভাবে এই ভাষা প্রভাবান্বিত। সংস্কৃতের প্রতি তামিলের বিরোধিতা বহুকালের এবং বটবৃক্ষের ন্যায় সম্প্রতি এক অদ্ভুত ভাষাবিভাগগত সার্বভৌমত্বের অদৃষ্ট প্রভাবকে স্থানচ্যুত করেছে।

প্রাচীন কানাড়া-সাহিত্য জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও লিঙ্গায়েৎ ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম। আধুনিক সাহিত্য রোমান্টিসিজিমের নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ; সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তা বোধ ; মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর আদর্শবাদ এবং নিদারুণ বিত্তহীন শ্রেণীর নিম্নগামী বস্তুবাদ ও প্রতীকবাদ। বর্তমান ধারা হচ্ছে মহাকাব্যে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সকল আধুনিক আন্দোলন ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রের সচেতন প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্য রোমান্টিক উপন্যাসের আদর্শ বাংলা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এসেছে। বাংলাই জাতীয়তা-বোধের উপকরণ যুগিয়েছে। সনেট জাতীয় কবিতা এবং নূতন ছন্দের কলাকৌশল সরাসরি ইংরেজী থেকে গৃহীত হয়েছে। জীবনের বৃহত্তর এবং গভীরতর অর্থ উপলব্ধি করতে কেউ কেউ মহাকাব্যের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। এতদ্‌ব্যতীত পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড থেকেও কতকগুলি মৌলিক সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল প্রচেষ্টার মূল্য কালের কষ্টিপাথরে নির্ধারিত হবে।

অনুকূল জলবায়ু, একটি জল-বিদ্যুৎ শক্তির উৎস এবং নানা প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধার জন্যে মহীশূর রাজ্য দূরদর্শী শাসনকর্তা ও দেওয়ানদের পরিচালনায় বহু পূর্বেই শিল্পীকরণের দিকে নজর দিয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা এখানে বহুদিন পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা স্নাতক মহীশূরেই হয়েছেন। শহরে মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স হচ্ছে কুড়ির কাছাকাছি এবং বড় নগরে শিক্ষিতদের মধ্যে কুড়ি বছরের পরেও বিবাহপ্রথা প্রচলিত। স্ত্রীশিক্ষার পরিমাণ অধিক থাকা সত্ত্বেও সেখানে পণপ্রথার প্রচলন আছে। অর্থলোলুপতা ও আত্মমর্যাদা-বশতঃ পাত্রেরা ও তাদের পিতারা পণপ্রথার দাবী করেন। যে পিতার ভাগ্যে পুত্র-কন্যা দুইই আছে, তিনি এই প্রথার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, যখন তাঁকে কন্যার জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে হয়। যখন সেই পিতার কাছে তাঁর পুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আরামে হেলান দিয়ে নূতন সুরে কথা বলেন।

পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত কর্ণাটকে দেখা যায়। সম-পরিমাণ টাকার বর-সজ্জা যৌতুক হিসাবে দেওয়ার কথাও পণের তালিকাভুক্ত থাকে এবং প্রায়শঃই তা দিতে হয়। উপহার দেওয়া পদ্ধতিগুলি অনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে, বর্তমানে যা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তা দুটি অর্ধদিনের

সমন্বয়ে একটি পূর্ণদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, একান্ত পরিচ্ছন্ন বিধিবদ্ধ আচারগত অনুষ্ঠানে হাতঘড়ি, দর্জির দ্বারা প্রস্তুত পোশাক, রৌপ্যপাত্র এবং রেশম ও লেসের ধুতি জামাতাকে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়। আবার এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যখন পাত্রপক্ষ কনেকে নানাপ্রকার উপহারে ভূষিত করেন, কিন্তু দু'পক্ষেরই উপহারের খরচ পাত্রীর পিতাকে বহন করার উদাহরণও বিরল নয়। 'মেয়ের বিবাহ দাও তাহলে ঠেলা বুঝবে'—দক্ষিণে এটি একটি কিংবদন্তীর মতো হয়ে গেছে। পাত্র নির্বাচনে আই. এ. এস, ও ইঞ্জিনিয়ার স্নাতকেরই বিয়ের বাজারে চাহিদা বেশী। পিতা-মাতাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীকে সাক্ষাৎকারের জন্যে একত্র করা হয় এবং উভয় পক্ষে 'আপত্তি নেই' কথার নির্দেশ পেলেই পাকাপাকি ব্যবস্থার ব্যাপার আরম্ভ হয়। পাত্রের ইচ্ছামতো পাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ খুব কমই ঘটে থাকে। সম-গোত্রীয় বিবাহই কর্ণাটকের সামাজিক বিধি।

অধুনা কর্ণাটক রাজ্যে জাতিভেদের ধারা দুই ভাগে বিভক্ত। লিঙ্গায়েৎ ও ভোক্কালিগেরা এই রাজ্যের দুটি প্রধান সম্প্রদায়—লিঙ্গায়েৎ ও তাদের অনুসরণকারীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং অপর অন্যান্য বিষয়েও বড়। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে বিরোধ কর্ণাটকে অত্যন্ত তীব্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় এই বিরোধের একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রোজগারী শিক্ষার শিক্ষায়তনে প্রবেশের বাধা-মূলক আইনকানুনসমূহ সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ সেগুলি বিষয়মুখীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিধিবদ্ধ হয়নি। এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করার জন্যে সম্প্রতি একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে।

ভোক্কালিগ সম্প্রদায় প্রধানতঃ ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবী। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ও ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবি, কিন্তু তারা চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিষয়েও লিঙ্গায়েৎ অগ্রণী। অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ায় লিঙ্গায়েৎরা আজ আর পূর্বের মত 'অনগ্রসর' সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হতে চায় না। এখন তারা তাদের সংখ্যানুপাতে সুযোগ-সুবিধা পেতে চায়। এ দাবী যথার্থই। প্রাচীন মহীশূর রাজ্যে এক সময় ভোক্কালিগ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল অধিক ; আজ তাদের প্রভাব অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে ; কিন্তু গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে আজ তারা প্রাচীন মহীশূর এলাকায় তাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করার দাবী করে। হরিজনরা একটি পৃথক সম্প্রদায় এবং তারা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য সম্প্রদায় সকল অপ্রধান, তারা কখনও এ-দলে কখনও সে-দলের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। চাকরির

নিয়োগ-ব্যাপারে ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধানিষেধ থাকায় এবং যথোচিত মাহিনা না হওয়ার জন্যে অধিকাংশ যুবকই, বিশেষ করে কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিরা, এই রাজ্য ছেড়ে সেই সব জায়গায় চলে যাচ্ছে, যেখানে পরিকল্পনার কাজ চলছে। ফলে এই রাজ্যের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। আইন সভায় এ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। সরকার এই অসুবিধা স্বীকার করেছেন এবং তা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্ণাটকের মানুষ কি প্রকৃতির? সে আজ এটাই বিশেষভাবে অনুভব করে যে, তীক্ষ্ণধী তামিল, জবরদস্ত অন্ধ্র, অনুপ্রবেশকারী মালয়ালী ও ঝগড়াটে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার শালীনতা মূল্যহীন। এর কারণ মনে হয় যে, বুদ্ধির দিক দিয়ে কর্ণাটকবাসীরা যদিও নিকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কৃষিজীবীদের সেই স্বাভাবিক জীবনীশক্তির অভাব দেখা যায়। উপরন্তু কর্ণাটকবাসীরা মিশুকে এবং পারতপক্ষে তাদের নিজেদের দলের লোকের সঙ্গে মেশে না। তার কর্ণাটক সঙ্ঘ, তার দলবাঁধার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যারা শক্তিশালী সমদলীয় গোষ্ঠী বহন করে, তারা তাদের সঙ্গে যোগদানের চেষ্টা করে এবং তাদের সঙ্গে পার্শ্বচরের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃত পক্ষে এটাই তাদের হীন ভাবাপন্ন করে তুলেছে।

এল. এস্. শ্রীপাথি

মহারাষ্ট্র

কোন দেশের জলবায়ু সেই দেশের বাসিন্দাকে কতদূর প্রভাবিত করতে পারে? আমার মনে হয় অনেকখানি। যদি তা না হয়, তাহলে মহারাষ্ট্রবাসীদের প্রকৃতি ও তাদের জীবনধারা ব্যাখ্যা করা একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়।

মহারাষ্ট্রের জীবনধারায় শ্রদ্ধার ভাব লক্ষিত হয় সাধারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের বহু-কিছুর প্রতি। কিন্তু স্থানের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে, যখন দেখা যায় কি ভাবে সেই শ্রদ্ধার বস্তুগুলি রক্ষিত, পালিত এবং দৃঢ়ীভূত হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কতকগুলি বস্তুর উপর অধিক মূল্য আরোপ করা হয়েছে এবং কতকগুলিকে একেবারে বাতিল করে দিয়ে তাদের বিপরীতগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, ইতিহাস ও রাজনীতি তাদের নিজেদের কাজ নিজেরা করে যায়, কিন্তু সর্বশেষ বিচারে, ইতিহাস ও রাজনীতি কোন একটি বিশেষ কালে, কোন একটি বিশেষ ধরণের বা অবস্থার মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কিভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তা নির্ভর করে তার প্রকৃতির উপর, যেটা আবার দেখা যায় তার পরিবেশ এবং জীবনধারার উপর নির্ভরশীল।

আমার মনে হয় যে বিষয়টাকে আমি যেন একটু জটিল করে ফেলেছি, সেই কারণে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব। সহজ ও সরল জীবনযাত্রা, জাঁকজমক পরিহার, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন এবং অধ্যাত্ম-চিন্তা, পরজন্মের চিন্তা, বিষয়ে অনাসক্তি, ঈশ্বর ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং সহনশীলতা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অংশ। এগুলির মধ্যে শেষের দুটি মহারাষ্ট্রের জীবন থেকে একপ্রকার বিলুপ্ত হয়েছে এবং তাদের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে জীবন সম্পর্কে এক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী, কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং গঠনশীল ও ধ্বংসাত্মক উভয়বিধ বিচারশীল মনোবৃত্তি। প্রথম দুটির উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, অধ্যাত্ম-চিন্তা বজায় রাখা হয়েছে; পরজন্মের চিন্তা এবং বিষয়ানুসক্তি মহারাষ্ট্রের জীবনে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত এই সব পরিবর্তনের জন্যে, আমার মনে হয় দেশের মাটিই এর উল্লেখযোগ্য কারণ। প্রকৃতপক্ষে মারাঠীরা তাদের দেশের মাটিরই সন্তান।

আধুনিক শ্রেষ্ঠ মারাঠী সাহিত্যিকদের মধ্যে গাডকরি একজন, তিনি মহারাষ্ট্রকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, 'পাহাড়-পর্বত সমাকীর্ণ এই রুক্ষদেশ, এর পদতল

আরব সাগর বিধৌত।' এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার, লোকের মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে, কিন্তু জীবন যাপন, তা সে ভূমিতেই হোক বা সমুদ্রেই হোক অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ,—প্রচুর পরিশ্রম, উদ্ভাবনশীলতা, আকস্মিক কার্যকরী শক্তি এবং বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেককেই পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু পরিশ্রমলব্ধ ফল অতি সামান্যই পায়। সুতরাং উত্তর-ভারতের ন্যায় এখানে কোন ঐশ্বর্যের তারতম্য তেমন উগ্র নয় ; এমন কি অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিকেও কাজ করতে হয় এবং সর্বক্ষণের কাজ করার জন্যে গৃহভৃত্যের কথা এখানে কেউ ভাবতেই পারে না। মানুষ এখানে অত্যন্ত সরলভাবে এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। উত্তর-ভারতের একজন ধনী স্ত্রীলোক বা পুরুষ যে পোশাক পরিধান করে, মহারাষ্ট্রের চারজন স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

মুঘলদের পরাজয়ের নানা কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল এই দেশের দুরূহ পার্বত্য-পথ। যেহেতু মুসলমান প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনি, সেই কারণে তাদের জাঁকজমক-প্রিয়তা, মেয়েদের পর্দাপ্রথা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেনি। মহারাষ্ট্রীয়দের এই আড়ম্বরহীনতা শুধু যে তাদের দৈনন্দিন জীবন, ধর্মাচরণ, স্থাপত্য এবং সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিকে প্রভাবান্বিত করেছে তা নয়, এর প্রভাব এদের ভাষাকে পর্যন্ত আক্রান্ত করেছে। মানদণ্ডের একদিকে যদি উর্দু থাকে, তাহলে অপরদিকে স্থান হবে মারাঠীর। মারাঠী ভাষায় কোন বক্রোক্তি বা অতিশয়োক্তির স্থান নেই। বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত ও মোলায়েম করে বলা হয় না এবং বক্তৃতা খুব জোরের সঙ্গেই বলা হয়ে থাকে। উত্তর-ভারতের কোমল ও মার্জিত ভাষার সঙ্গে যারা অভ্যস্ত, তাদের নিকট এই ভাষা ও তার প্রকাশ খুবই উগ্র বলে মনে হবে। মারাঠীরা বহুদিন যাবৎ স্বাধীন থাকায় বহু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। যদিও প্রায়ই মারাঠীদের আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হ'ত, কিন্তু সেজন্যে সাধারণ নাগরিকের জীবনে বিশেষ কোন বিপর্যয় ঘটেনি এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও অধ্যাত্ম-জীবনগত সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। এই ঐতিহ্য এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল যে তিলক ও গোখলের ন্যায় রাজনীতিবিদ্‌ও ঘোর সংগ্রামের মধ্যেও তাঁদের অধ্যয়ন অব্যাহত রেখেছিলেন। বস্তুতঃ, তিলক বলেছিলেন যে, যদি তিনি বৃটীশদের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন বোধ না করতেন, তাহলে তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক হতেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক ধারার কখনও ছেদ ঘটেনি এবং প্রতি শতাব্দীতে চিন্তাশীল ব্যক্তি, শিল্পী ও দার্শনিকের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারা শুধু যে মনীষী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সর্বস্তরেই এর ব্যাপ্তি

ঘটেছিল। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মহারাষ্ট্রেই অধিক সংখ্যক সংগীত প্রতিষ্ঠান, নাট্যসমাজ ও পাঠকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়। ছোট ছোট গ্রামেও নাটক ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। কীর্তন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত, এই গান স্বুর ও শিক্ষার সমন্বয়ে রচিত। মারাঠী কীর্তন উত্তর-ভারতের কীর্তন থেকে পৃথক। কারণ তা হচ্ছে, বেয়াসিক পদ্ধতির, অর্থাৎ গানের সঙ্গে থাকে নীতিমূলক কাহিনী, যার সঙ্গে আবার জড়িত থাকে ছোট ছোট উপাখ্যান।

জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় লাভের দুরূহতা মারাঠীদের সামরিক ভাবাপন্ন করে তুলেছে। এই মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যুক্তিবাদের সংস্পর্শে এসে অধিকতর দৃঢ়তালাভ করেছে। মারাঠীরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না, নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তারা চরম সংগ্রাম করে। মারাঠীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা এত বেশী যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার তুলনায় তাদের কাছে সব কিছু ছোট বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রে ধর্মীয় বাধানিষেধ ও রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নারীর স্থান পুরুষের সঙ্গে একত্র কাজ করার ফলে, তাদের সঙ্গে সমান অংশীদার হওয়ায় এবং পর্দাপ্রথা না থাকায়—উপর্যুক্ত পদ্ধতিকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। মারাঠী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে এবং তাতে তারা এতটুকুও সংকোচ বোধ করে না; এটা কেবলমাত্র নগরের বৈশিষ্ট্যই নয়—সমগ্র দেশেই এর প্রচলন। কিন্তু মারাঠীদের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারমূলক মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে কুফলও সৃষ্টি করেছে। মারাঠীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা গুণটি লক্ষ্য করা যায় না। লোকেরা পরস্পরের সম্পর্কে অত্যন্ত বিচারশীল। 'মেজ রামায়ণে'র লেখক তুলাজপুরকার বলেছেন যে, যদি পুণায় কোন প্রতিষ্ঠান তার শৈশবকাল অতিক্রম করে, তাহলে যে কোন স্থানেই এর বিস্তার ও বৃদ্ধি ঘটবে, কারণ সকল প্রকার ঝড়ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করার এর স্বাভাবিক শক্তি জন্মায়। অন্যত্র যেখানে বিনা রূঢ় বাক্য প্রয়োগে কোন বিষয়ের মীমাংসা হবে, এখানে তা এমনই যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে নিষ্পন্ন হবে যে, অপর যে কোন দেশ হলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এই প্রকার বিরোধের পরেও যে বেঁচে থাকে, এর কারণ হিসাবে আমার মনে হয়, উদ্দেশ্যের প্রতি সভ্যদের লক্ষ্য থাকে এবং সেই কারণেই তারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে নিয়ে যে যার কর্ম করে যায়।

পরজন্মের প্রতি আকর্ষণ ও বিষয়ানুসক্তি এখন অন্যভাবে অনুশীলিত হওয়ায় তার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একটা মিলনের ভাব দেখা যায়। পরজন্মের প্রতি

আকর্ষণ এখন সকলের কল্যাণসাধনের দিকে রূপান্তরিত হয়েছে ; মহারাষ্ট্রের জীবনে সাম্যবাদ আজ একটি বিশেষ শক্তিশালী ভাববস্তু। আর বিষয়ানুসক্তি রূপান্তরিত হয়েছে অপরকে নিজের সঞ্চিত অর্থের অংশীদার করার আকাঙ্ক্ষায়। বেশীরভাগ লোকই নিজেদের গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করে জীবিকার সংস্থান করে। তারা সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা করে এবং সভা-সমিতি ও বক্তৃতার আয়োজন করে। সারা মহারাষ্ট্রে ছেলেদের এমন একটি বিদ্যালয় নেই, যা সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়। সবগুলিই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। মহারাষ্ট্রের লোকদের নগদ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য বিশেষ নেই, কিন্তু তারা 'বর' ও 'মাধুকরী' পদ্ধতি অভ্যাস করেছে, যা মহারাষ্ট্রেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 'বর' শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে 'দিন', এবং 'মাধুকরী' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মধুকরদের পন্থা'। গ্রাম থেকে শহরে আগত দরিদ্র ছাত্রেরা পালাক্রমে বিভিন্ন পরিবারে আহার করে থাকে ('বর' পদ্ধতি) বা প্রতিদিন কতকগুলি পরিবার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ('মাধুকরী' বৃত্তি)। এটি কোন লজ্জাজনক ব্যাপার নয়। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এই পদ্ধতিতে নিজেদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। রাণাডে-প্রতিষ্ঠিত 'পয়সা ভাণ্ডার' প্রতি মাসে প্রতি পরিবারের কাছ থেকে একটি করে পয়সা সংগ্রহ করে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

কতকগুলি বিশেষ বস্তু মারাঠীদের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান স্থান দাবী করে। যে সকল উক্তি করা হয়েছে, সাধারণভাবে সেগুলি তাদের জীবনে সত্য, কিন্তু সর্বত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্যই দেখা যায়।

বিজয় মূলে

রাজস্থান

ভুলক্রমে রাজস্থানকে বলা হয় ছয়টি বিভিন্ন-ধর্মী সংস্কৃতির সংমিশ্রণের দেশ। আরাবল্লী পর্বত এই রাষ্ট্রকে দুটি অসমভাগে বিভক্ত করেছে—একদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রৌদ্রদগ্ধ বালুকাময় অনুর্বর অঞ্চল ও অপরদিকে অতি-উর্বর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল —উভয় অঞ্চলের সাধারণ জীবনধারার মধ্যে যে স্থানীয় বিভেদ ও রূপান্তরগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি মূলতঃ আপাতপৃথক। কিন্তু উভয় অঞ্চলের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ যে আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়, আসলে তার উৎসধারা একই এবং সেই কারণে তা আচার-ব্যবহারের বৈষম্যকে প্রকট করে না, যেটা জলবায়ু ও নানা অবস্থার এত পার্থক্যের মধ্যে হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

যে উচ্চ অঞ্চলগুলি নিম্ন বালুকাময় মাড়ওয়ার থেকে উচ্চ মেবারকে পৃথক করেছে, সেগুলি উক্ত স্থানগুলির অধিবাসীদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে পারেনি। ঐতিহাসিক টড্-এর মতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের মূলে আছে কতকগুলি স্থানীয় ঘটনা, কিন্তু মানসিক ঐক্যের উৎস হচ্ছে মূলগত নীতি, যা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর প্রতি আস্থাবান করে তুলেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সমগ্র অঞ্চলটি চিরদিনই একটি অখণ্ড দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং সেখানে এমনই একটি মূলগত ঐক্য আছে যে সেই কারণে অধিবাসীদের মনে এক জাতিসত্তার আদর্শ স্থান পেয়েছে। এর সংস্কৃতি মানবপ্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন অব্যাহত তেমনি জীবন্ত ও গঠনধর্মী।

শৌর্য, বীর্য ও প্রাচীন রোমান্সের পরিচিত আবাসস্থল রাজস্থান সমগ্র ভারতে তার সংগীত ও গাথার জন্যে বিখ্যাত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী রাজস্থান ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার লীলাভূমি হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন এর অধিবাসীদের শৌর্যবীর্যের সমন্বয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু এই উষর অঞ্চলগুলি সম্ভবতঃ এক মাত্র স্থান, যেখানে মুসলমান শাসনের পাঁচশত বৎসরকাল রাজপুতেরা তাদের আধিপত্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই কারণে, সেই অঞ্চলগুলিতে তাদের একটি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন পৌরাণিক ধারণা, কুসংস্কার, উৎসবাদি, লোক-সংগীত ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় সংগীত এবং প্রচলিত প্রথা একটা সাধারণ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র রাজস্থানেই ভূমির অধিকার ও দখলি স্বত্বাবলী প্রচলিত প্রথা ও দেশজ আইনের দ্বারা সকল সময়েই পরিচলিত হয়েছে। বহু শতাব্দীব্যাপী অধিবাসীরা স্থানীয় পঞ্চায়েতদের এবং চবুতর বিচার পদ্ধতির দ্বারা শাসিত হয়েছে। ক্ষমতার এই চিরা-চরিত বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মতো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় কৃতকার্য হয়ে সমগ্র দেশকে একটা নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃতজ্ঞতা, সম্মানবোধ ও আনুগত্য রাজস্থান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাজস্থানের সাংস্কৃতিক ঐক্য সমগ্র অধিবাসীদের জাঁকজমকপূর্ণ বিভিন্ন উৎসবাদি প্রতিপালনের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। জনসাধারণের প্রতিভার জাজ্জ্বল্যমান বৈশিষ্ট্য তাদের ঐক্যবদ্ধ জীবনবোধের মধ্যে প্রতিভাত হয়—যেটা রাজস্থানের উৎসবাদিপূর্ণ দিনপঞ্জীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। রাজস্থানের কোন অংশই হোলি-উৎসবকে উপভোগ করতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। গঙ্গার উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা বিশেষ-ভাবে সাজসজ্জা করে ও গৌরীকে সসম্মানে বিদায় জ্ঞাপন করে, এবং সেদিন তাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। সমগ্র রাজস্থানব্যাপী 'তীজ' উৎসব নানা মনোরম মেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে বলা যায় যে একজন রাজস্থানীর জীবন নানা উৎসব, মেলা ও আমোদ-প্রমোদে পরিপূর্ণ। রাজ্যের কতকগুলি বিখ্যাত মেলা আছে, যেমন—অষ্টমী, নবরাত্র, জগন্নাথ রথযাত্রা, জীন মাতাকা মেলা, শীতলা মাতাকা মেলা প্রভৃতি—যেগুলি সমগ্র রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

প্রাচীন শিল্পকলা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এই রাজস্থান ভারতবর্ষের পরম রমণীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। জীবন সম্পর্কে এই রমণীয় দৃষ্টিভঙ্গী এর সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যবান করেছে। বহুশতাব্দীব্যাপী এই রাজ্য সুন্দরী রমণী, চিত্তাকর্ষক মণিমুক্তাদি ও প্রাচ্য সাজসজ্জার আবাসস্থল হিসাবে গণ্য হয়েছে। রাজস্থানের সমগ্র অঞ্চলে মেয়েরা আজও সুন্দর প্রাচীন জড়োয়ার গহনাদিতে ভূষিতা হয়। এমন কি, অতি দরিদ্র কৃষক রমণীও বিশেষ কারুকার্যখচিত অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে, যদিও তা রৌপ্যনির্মিত। রাজস্থানে উষর মরুময় অঞ্চলগুলি তাদের রমণীদের দ্বারা শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। রাজস্থানী পুরুষদের অত্যুজ্জ্বল 'সফা' বা উষ্ণীষ, তাদের সুপ্রশস্ত স্কন্ধদেশকে একটা মর্যাদাব্যঞ্জক গাম্ভীর্যদান করে। বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতের সৌন্দর্যময় পটভূমি, উষর ও উষরপ্রায় অবসন্ন মরু অঞ্চলগুলি যাদের স্থানে স্থানে আছে সবুজ তৃণভূমি ও কুটীরশ্রেণী —এই পরিবেশমণ্ডিত রাজস্থানের লোক-সংগীত কর্মরত কৃষকদের বলিষ্ঠ নৃত্যের দ্বারা মুখর হয়ে ওঠে। রাজস্থানের সকল প্রকার নৃত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জয়প্রিয় নৃত্য হচ্ছে 'ঘুমর'। এই নাচের সৌন্দর্য, জাঁকজমক ও শ্রী চমকপ্রদ ঘাগরাদ্বারা

কাশ্মীরের একটি খাঁটী কৃষক বালিকা

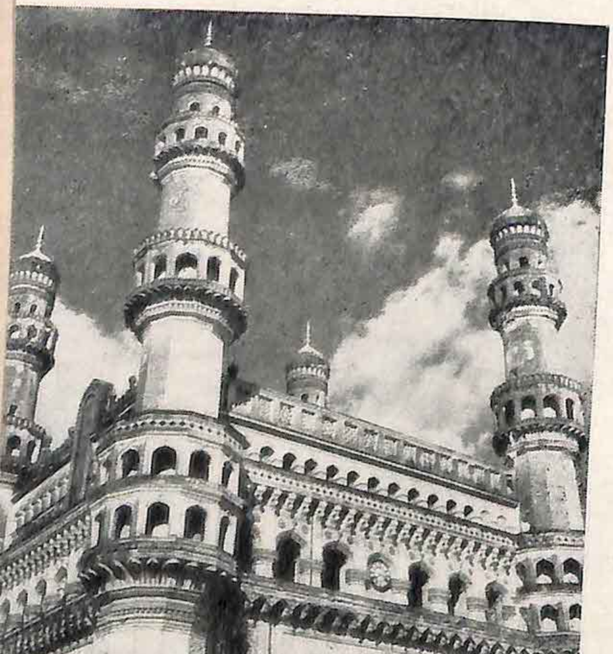


পেপস্থ-র লোকেরা বলিষ্ঠ লুডি-লোকনৃত্যে রত





বিখ্যাত হাওয়া মহল, প্যালেস অব দি উইণ্ডস, জয়পুর, রাজস্থান



হায়দ্রাবাদের চারমিনারের চূড়া ও সমতল ছাদ

আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'ঘুমর' নৃত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে 'গায়ের'— যেটা জীবনকে 'জিগ' নৃত্যের মতো নরনারীদের প্রবল অঙ্গভঙ্গীসহ এবং নানা বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত তালসহ প্রচুর আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আর একটি মনোমুগ্ধকর নৃত্য হচ্ছে 'পানিহারি'।

রাজস্থানের অধিকাংশ লোক সারা বছরই প্রধানতঃ বজরা ও দুগ্ধ পান করে। তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে বজরা, ময়দা এবং তাদের দুটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে, রাবড়ি আর খিচ্‌রি, যা তারা সাধারণতঃ মাখন ও দুগ্ধসহযোগে খেয়ে থাকে। পুরুষেরা প্রশস্ত বস্ত্র পরিধান করে, তা দুই পায়ের মধ্যে দিয়ে ভাঁজ করে, অল্প চাদরজাতীয় একটা কিছু কাঁধে ঝুলিয়ে দেয় ও মাথায় একটা রঙিন পাগ্‌ড়ী পরে। রাজস্থানের সর্বত্রই মেয়েদের পোশাক হচ্ছে রঙিন, ডোরা-কাটা বা ছাপা কাপড়ের ঘাগ্‌রা এবং শালের মতো মাথার উপর দিয়ে ঝুলানো একটা উড়নি। কাঁচের টুক্‌রো-বসান ঝকঝকে রঙিন পোশাক-পরিচ্ছদ, যা রৌদ্রে উজ্জ্বলতর হয়, এবং খুব কারুকার্যখচিত কাঁচলি—এই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বিবাহিতা মেয়েদের পোশাক।

রাজস্থানের স্থাপত্যশিল্প তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সেখানে দেখা যায় একই ধরনের মণ্ডপ, পাথরের কাজ, মন্দির, দুর্গ, বিজয়স্তম্ভ এবং ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে সজ্জিত রাজপ্রাসাদ, সুন্দর প্রস্তরমূর্তি, যা শ্রী ও বলিষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসাবে স্বতন্ত্রতা দাবী করে।

রাজস্থানী চারুকলার স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেউদ্ভূত এবং যা বহুলাংশে লোকশিল্পধর্মী তা নানা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে রঙের সুসমতার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী।

অতীতে রাজস্থানে বহু রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটেছে, কিন্তু সে হেতু তার প্রাচীন আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি কোন অবস্থাতেই ব্যাহত হয়নি ; কিন্তু রাজস্থান আজ এক সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষের অপর কোন অঞ্চলে এখনকার অপেক্ষা পরিবর্তনের গতি এত বিপ্লবাত্মক, সুদূরপ্রসারী ও সুদৃঢ় হয়নি। মাত্র বারো বৎসর পূর্বেও সমগ্র অঞ্চল রাজতান্ত্রিক প্রথা, সামন্ততান্ত্রিক আচারবিধি এবং শ্রেণীগত সমাজব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হ'ত। বর্তমানে, প্রাচীন রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই সবকিছুই বিলুপ্ত হয়েছে। পরম্পরার দিক দিয়ে রাজস্থান হচ্ছে রোমান্সের দেশ, অতীত মহিমা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু আজ আর সে রোমান্সের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না, কারণ রোমান্সের ত্রুটি হচ্ছে যে তা 'অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং বর্তমানের উপর অতীতকেই গৌরবময় করে।' তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আজ এই সন্ধিক্ষণে তার পিছনের দিকে তাকালে চলবে না।

ভি. ডি. শর্মা

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার অধিকাংশ অঞ্চলে সামাজিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেরই অনুরূপ। উড়িষ্যার অধিকাংশ অঞ্চলে সামাজিক ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা একই ধরনের। যে সকল উপজাতি পার্বত্যঅঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তারা আজও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বজায় রেখেছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। এমন কি তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে, যারা নিজেদের ভারতীয় আর্য বলে গর্ব অনুভব করে, এমন সব উপাদান আছে যা বিবিধ সংস্কৃতি উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে, বহু পূর্বেই যেগুলি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল।

তিনটি প্রধান রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিয়ে উড়িষ্যা রাজ্য গঠিত—তাদের মধ্যে কোন কোন রাজ্যের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। এই তিনটি রাজ্য হচ্ছে কলিঙ্গ, উৎকল ও ওড্রদেশ। এক সময় তাদের সামরিক শৌর্য ও দূর-দেশান্তরের সঙ্গে সামুদ্রিক-বাণিজ্য সম্পর্কের গৌরবময় দিন ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই অংশের জনসাধারণ একদিন অশোকের আক্রমণকারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল এবং অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পরে অহিংসানীতি গ্রহণ করেছিলেন। সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কের দিক দিয়ে আজও পর্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা কলিঙ্গের 'ক্লিং' নামে পরিচিত এবং এমন সব জায়গা আছে, যেগুলি পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রের শ্রীক্ষেত্র নামে পরিচিত। অশোকীয় যুগের পরবর্তীকালে কলিঙ্গ সম্রাট খরবেলা তাঁর রাজ্যকে কলিঙ্গের সীমানার বাইরে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে, এই দেশের লোকেরা তাদের সীমানার বাইরের নানা সংস্কৃতির সম্পর্কে এসেছিল—যে সব সংস্কৃতি হয়তো তাদের অনুকূলেই ছিল বা তাদের বিরোধী ছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই মিলন এই দেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। ইতিহাস থেকে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করি যে, বিরোধী সংস্পর্শে, যদিও তা বিজয়ে পর্যবসিত হয়, তা অবশ্যই বিজেতা বা বিজয়ীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও আদিবাসী (আদিম অধিবাসীরা) সংস্কৃতি নিশ্চয়ই এদেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই কারণে উড়িষ্যার বর্তমান সাংস্কৃতিক গঠন বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। এতদ্ব্যতীত এই সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানেরও অস্তিত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ কার্তিক মাসে ধান গাছের পুষ্পোদ্গমে যে আনুষ্ঠানিক

পূজা-বিধি আছে, তা আদিবাসী সংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। কার্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সোলার নৌকা ভাসান দেওয়ার উৎসব এবং আষাঢ়, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই চারটি পবিত্র মাসের নামোল্লেখে এই কথাই বোঝায় যে, সমুদ্রগামী নৌকাযাত্রার এটাই প্রশস্ত সময়। সত্যপীরের পূজা হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়।

উড়িষ্যায় যদিও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু জগন্নাথ দাসের ভাগবত থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত দুটি ছত্রে যে নীতির কথা বলা আছে, তারই উপর ওড়িয়াদের জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত ঃ

'সকল ঘটে নারায়ণ
বাসন্তী অনাদি কারণ।'

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 'সেই অনাদি মহৎকারণ সর্বসত্তায় বিদ্যমান।' সুতরাং সব মানুষই সমান। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আজও এই নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়, কারণ এখানে কোন জাতিভেদের প্রশ্ন নেই। খুব সম্প্রতিই একমাত্র উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকার আছে এই মর্মে একটি ফলক প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছে। তপশীলভুক্ত জাতীয় ভীম ভোই উড়িষ্যায় একজন সাধু বলে অভিহিত হয়ে থাকেন, তাঁর ভজন এখনও উড়িষ্যার সর্বত্র গীত হয়। উড়িষ্যায় যখন আমি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করছিলুম, তখন একজন মুসলমানের মুখ থেকে হিন্দুশাস্ত্রের দীর্ঘ আবৃত্তি শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

সাম্যের এই মূল নীতিটির ফলে, 'নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচতে দাও', রূপ নীতিটির উদ্ভব হয়েছে। 'সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা' জীবনধারণের প্রচলিত এই ধারা অনুসারে উড়িষ্যার বৈষয়িক সম্পূর্ণতা উড়িষ্যার জীবনদর্শনকে উন্নত করতে সহায়তা করেছে।

বংশ পরম্পরাগত সামরিক ধারা অব্যাহত চলেছে, যদিও পুরাকালের মত তা ততো উগ্র নয়, এর কারণ হয়ত বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে চৈতন্য তাঁর ভক্তি ও প্রেমের আদর্শ নিয়ে উড়িষ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই মতবাদের প্রভাব উড়িষ্যার শান্ত জীবনধারাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে, শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উড়িষ্যার একজন সাধারণ গ্রাম্য লোকও নৃত্য, গীত ও নাটকাদি উপভোগ করতে সক্ষম। এই সংগীত-প্রীতি উড়িষ্যার সর্বত্র শাস্ত্রীয়জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করেছে। প্রত্যেক গ্রামেই পুরাণ-পাঠের জন্যে ভাগবত তুঙ্গী (যাকে ক্লাব বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল ভাগবত তুঙ্গীর নমুনা আজও দেখা যায়।

চৈতন্যের ধর্মমত উড়িষ্যার এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে আরও দৃঢ়ীভূত করেছিল। কিন্তু চৈতন্যের শিক্ষা সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বৈষয়িক অভ্যুদয়ের প্রেরণাকে অনেক দিন খর্ব করে দিয়েছে। গ্রামের মধ্যে এই শান্ত মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ইউরোপীয়ানদের ভারত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উড়িষ্যায় এই শান্ত জীবনধারা অব্যাহত ছিল। প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা, মূলতঃ যা পেশাভিত্তিক এবং পরে যা জাতিভিত্তিকে পরিণত হয়, তা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, কারণ তারা কোন সামাজিক ভেদকে স্বীকার করেনি। জাতিভেদের উগ্রতা নমনীয় হয়েছিল, যখন সর্বজাতের ছেলেমেয়েরা ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে আরম্ভ করেছিল। ষাট বৎসর পূর্বে যে সকল জাতি অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হ'ত, তারাই একদিন 'স্পৃশ্য' হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাতে বৈষয়িক উন্নতি প্রাধান্য-লাভ করেছে তা সেই সব মানুষেরও দৃষ্টিকে ঝলসে দিয়েছে, একদিন যারা অতি সরল জীবনযাপনে পরম তৃপ্তিলাভ করত। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি সেই সব মানুষের উপর পড়েছিল, যারা এই নূতন কাঠামোতে যশ, মান, খ্যাতি ও ঐশ্বর্যলাভ করেছিল। এইটিই একটি নূতন সম্প্রদায়ের বীজ বপন করেছিল।

আধুনিক বিদ্যালয়গুলি ধর্মহীন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সামাজিক বিপ্লববাদীর দ্বারা জাগতিক উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় চিরাচরিত মনের স্থৈর্যের ভাব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জীবন-সংগ্রাম এবং চিরাচরিত বিশ্বাসের দৌর্বল্যের ফলে একদিন প্রারব্ধ কর্মের উপর যেভাবে ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল, আজ তা দ্রুত বিলুপ্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। এ সত্ত্বেও অন্তরের গভীরে চিরাচরিত জীবন-ধারার প্রতি একটা মমতাবোধ আছে। কতদিন যে এই অন্তর্নিহিত মমত্ববোধ বজায় থাকবে তা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত।

পি. পরিজা

জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর নামটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এটি একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র। রাজনৈতিক ও প্রশাসনের দিক দিয়ে, এই রাষ্ট্রটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও মধ্য-পর্বের শেষাংশের সাম্প্রতিক সৃষ্টি ; এটি বৃটীশ বিজেতাদের সৃষ্টি নয় ; এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ডোগরা প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রের মহারাজা গুলাব সিং।

ব্যাপকভাবে বলা যায়, এই রাষ্ট্রটি কতকগুলি বিশেষ ভাষা-ভাষী এবং সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সমষ্টি, যথা— (ক) জম্মু, ডুগর এবং পহর, (খ) কাশ্মীর উপত্যাকা, (গ) দূরবর্তী পূর্বাঞ্চল লাডাক্। এতদ্‌ব্যতীত উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বে গিলগিট ও স্কারডু অঞ্চল অবস্থিত এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মুজাফরাবাদ, কোট্‌লি ও মিরপুর—রাষ্ট্রের কতকগুলি অংশ আজও পাকিস্থানের অধিকারভুক্ত। জম্মুর দক্ষিণ অঞ্চলে একটি সংকীর্ণ সমতলভূমি না থাকলে, এটি মূলতঃ একটি পার্বত্য দেশ যা উচ্চ পর্বত এবং গিরিসংকটের দ্বারা নানা উপত্যকায় বিভক্ত—যার অধিকাংশ স্থলই স্বল্প বসতিসম্পন্ন। এরা ভৌগোলিক ব্যবধানবশতঃ পরস্পরের মেলামেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে পরস্পরের পৃথক এবং জাতিগত ও ভাষাগত এবং ধর্মীয় পার্থক্য হেতু এই পৃথক অঞ্চলগুলির মধ্যে মোটেই কোন সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি ; তাদের জীবনধারা এবং জীবন-যাপনের রীতি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের আচার-ব্যবহার এবং জীবিকা, এমন কি চরিত্রের দিক দিয়েও তাদের মধ্যে কোন ঐক্য দেখা যায় না। প্রশাসনিক ঐক্য, সুদূর প্রসারী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, সহজতর সমাযোজন এবং পরিকল্পনাসম্মত উন্নতি অবশ্য একটা পরিবর্তন সাধন করেছে এবং জনসাধারণকে সাংস্কৃতিকভাবে পরস্পরের নিকটতর করেছে।

জম্মুর দক্ষিণ-পূর্বদিকে ডুগর অঞ্চলে ডোগরাদের আবাসভূমি ; ডোগরারা হচ্ছে অত্যন্ত সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু জাতি, যারা ডোগ্‌রি ভাষায় কথা বলে, যা পঞ্জাবী ভাষারই সমগোত্রীয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী দুরূহ রুক্ষ অঞ্চলে বসবাস করেও ডোগ্‌রারা তাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীন মানুষের চারিত্রিক মনোবৃত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই হিন্দু এবং তারা নানা জাতিতে বিভক্ত। এই জাতিগুলি প্রধানতঃ নানা রাজপুত গোষ্ঠীভুক্ত, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী ও মহাজন। এ ছাড়াও আছে হরিজন, যাদের স্থানীয় নাম হচ্ছে মেঘ, চামিয়ার ও ডুম্ব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রাজপুতদের স্থান সকল গোষ্ঠীর উর্ধ্বে ; তাদের জীবিকা হচ্ছে সৈনিক জীবন ও চাষ-

আবাদ। আর হরিজনরা হচ্ছে সামাজিক তুলাদণ্ডে অত্যন্ত নিম্নস্থানীয় এবং তারা তাদের এই জাতির জন্যে নানা অসুবিধা ও হীনতা ভোগ করে। ডোগরারা সাধারণতঃ আমাদের প্রিয় ব্যক্তি ; তারা নাচগানের অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য ও এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'বাসলি' চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিকে কমবেশী বজায় রেখেছে। কাশ্মীরের উপত্যকা ও জম্মুর বহির্ভাগে অবস্থিত পাহাড়গুলির মধ্যে সুউচ্চ পহর অবস্থিত, (রাজোরি, মেন্ধর, পশ্চিমাঞ্চলের পুঞ্চ ও ভদ্রওয়া, এবং পূর্বাঞ্চলের কষ্টওয়ার), এই শহরগুলির বহির্ভাগে বসবাস করে আর সকলের মধ্যে মুসলিম বকরওয়াল ও গুজরেরা এবং হিন্দু গাদ্দিসেরা, যারা এখনও ভ্রাম্যমাণ এবং পার্বত্য-উপজাতির সভ্যতার স্তরে অবস্থিত। কাশ্মীর উপত্যকা, ইতিহাসে যা চিরদিন ভূস্বর্গ নামে খ্যাত, 'ফিরদৌস বর রূয়ে জমিন' হচ্ছে একটি উর্বর উপত্যকা, যেখানে প্রচুর জল সরবরাহ হয়।

ঐতিহাসিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রদেশ হিসাবে যেমন কাশ্মীরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি এর ইতিহাসের গতিও নানা কারণে খর্ব হয়েছে। বৌদ্ধ যুগে এটি শিক্ষার পীঠস্থান ছিল এবং লাডাক ও তিব্বত পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দিক দিয়ে এর একটি বিশেষ অবদান দেখা যায়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে দেশজ শৈব-দর্শনের অভ্যুত্থান হয় যা ত্রিক অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত, এবং যা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে প্রচলিত বেদান্তের উগ্র মায়াবাদের সংস্কার সাধন করেছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামের প্রভাব দ্রুত এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, যার ফলে শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র হিন্দুর অস্তিত্ব বজায় ছিল, যারা ইতিহাসের প্রতিসরণকারী স্রোতের মধ্যে অর্ণবপোত থেকে নিক্ষিপ্ত ভাসমান দ্রব্যাদির ন্যায় অতি নগণ্য স্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও কলা, বিজ্ঞান ও দর্শন ব্যাপারে কাশ্মীরীদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, এবং ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় পারসীয় কবিতা সম্পর্কেও অবদান নগণ্য ছিল না। তাদের মাতৃভাষা কাশ্মীরী, যা এখন সুসংস্কৃত পারসীয় আরবীয় লিপিতে লিখিত হয়, তা যদিও বহুদিন অবজ্ঞাত হয়েছিল, তত্রাচ তাদের সাহিত্যের পরিমাণ কিছু কম নয়। তারা চিরদিনই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উদ্ভাবন-শীলতা এবং পরিশ্রমের জন্যে যেমন বিখ্যাত, তেমনি বিখ্যাত সর্বপ্রকার কর্ম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে। কারুকলার দক্ষতার জন্যে তারা বিখ্যাত এবং তাদের সূচীকর্ম, সূক্ষ্ম সীবনকর্ম, কাষ্ঠ খোদাই, কাগজের মণ্ডকৃত ব্যবহার দ্রব্যাদি, এবং সর্বোপরি শাল তৈরির কাজ সারা পৃথিবী বিদিত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের এই দেশ জয় করার পর থেকে তারা বংশ পরম্পরায় উৎপীড়িত হয়ে দুর্বল জাতি হয়ে পড়েছিল। এই সম্প্রতি, বিশেষ করে ১৯৪৭-৪৮ সালে, তারা সবাই সমবেতভাবে আক্রমণ-

কারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং তাদের জাতীয় আত্মসম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

কাশ্মীরীরা যদিও দুর্বল এবং আচার-ব্যবহারে সরল, তত্রাচ জীবনের ভালো জিনিস, ভালো খাদ্য এবং সূক্ষ্ম পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ আছে, এবং সুযোগ ও সুবিধা পেলে তারা তা সদম্ভে জাহির করতে কুণ্ঠিত হয় না। কাশ্মীরীদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই মাংসাশী এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (cuisine) পাক প্রণালীর জন্যে খ্যাত। প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা, বা নৃত্যগীতাদি, চারুকলা, বা ভাস্কর্যের পারম্পর্য তারা প্রায় কিছুই বজায় রাখেনি, কিন্তু আকবরের সময়ে সূক্ষ্মদর্শী আবুল ফজল থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সার্ ওয়ালটার লরেন্স পর্যন্ত, সংস্কৃতি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর সূক্ষ্ম ও সুগভীর অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করেছেন, বিশেষ করে আজও পর্যন্ত ব্যাপক প্রচলিত অতীন্দ্রিয়বাদ ধারার মধ্যে যা চতুর্দশশতাব্দীতে লাল ডেড ও নাণ্ড রয়োসের কালে উদ্ভূত হয়ে সামাদ মীর (মৃত্যু-১৯৫৯) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সামাদ মীরের কণ্ঠে গীত হয়েছিল :

সামাদ মীর যা বলেছেন, তা শাস্ত্রের কথাই বলেছেন ;

বল ওঁ স্বূ, বল ওঁ স্বূ

এবং প্রকৃতপক্ষে স্যার ওয়ালটার লরেন্স, যিনি উপত্যকাটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন যে তৎকালীন পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানদের তুলনায় কাশ্মীর হিন্দুদের সম্পর্কে এবং স্থানীয় মুসলীম ঋষি ও বাবাদের পবিত্র স্থানগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সহনশীল ছিল।

কাশ্মীরের নিজস্ব কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র আছে, যথা—সাজ ও সনটুর ; এবং সংগীতে হিন্দুস্থানী ধারা ও পারসীয় এবং মধ্য-এশীয় ধারার প্রভাব দেখা যায় ; কিন্তু ছক্রি লোক-সংগীত এবং বচনাগম্ (ছোক্রা নাচিয়েরা) সংগীত ব্যতীত, কাশ্মীরী গীত-বাদ্যাদি বিশেষভাবে শোকপূর্ণ, করুণ এবং আনন্দবর্জিত। লোকেরা মেলা প্রভৃতি উৎসবাদির খুব প্রিয়। এবং বসন্তকালে প্রাচীন (ধর্মনিরপেক্ষ) বাদামফুলের উৎসবাদি ব্যতীত 'আর' ও 'মেলা' প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যোগদান করে।

যোজি-লা'র অপর অংশে এবং কারগিলের মুসলিমপ্রধান সীমানার বাহিরে লাডাক অবস্থিত। ১০,০০০ হাজার ফিট উচ্চে এই উষর সমতল মালভূমি। এটা বিশেষভাবে সেই সব বৌদ্ধ অধ্যুষিত যাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারা তিব্বতীয় এবং লামীয়। তাদের ভাষা হচ্ছে বোধী, এবং তাদের বর্ণলিপি হচ্ছে 'কা-গা', যা দেবনাগরীরই

অনুরূপ। গোম্পা বা মঠকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনধারা পরিচালিত, এবং গোম্পাগুলির সঙ্গে জড়িত আছে বিখ্যাত অসুর নৃত্য ও অন্যান্য নৃত্যগুলি, যা অতিপ্রাকৃত ঘটনার অভিনয় হিসাবে গোম্পাগুলির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রধান খাদ্য হচ্ছে ময়দা মিশ্রিত 'গ্রিম্' এবং তা চা ও মাখনযোগে খায়; এবং জাতীয় পানীয় 'ছং' এ থেকেই চোলাই করা হয়। লাডাকীরা কঠোর জীবনযাপন করে, কিন্তু তারা সরল ও সুখী লোক এবং সৎ ও বিশ্বাসী।

জে. এল. কাউল

লেখক-পরিচিতি

এম. মুজীব— উপাচার্য, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নয়া দিল্লী।

লক্ষ্মী মেনন— উপমন্ত্রী, পররাষ্ট্র দপ্তর, নয়া দিল্লী।

অশোক মিত্র— মহানিয়ামক এবং আদমশুমার মহাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ, নয়া দিল্লী।

এস. বি. চৌধুরী—সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়ার্স, এস. আর. ও সি. এ. দপ্তর, নয়া দিল্লী।

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী—অধিকর্তা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চিরায়ত সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাজ।

জি. ডি. সোন্ধী—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গভর্নমেণ্ট কলেজ, লাহোর এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের যুব-কল্যাণের অবৈতনিক উপদেষ্টা।

বি. প্রসাদ— প্রাক্তন উপাচার্য, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা।

এল. এস. শ্রীপথি— সাংবাদিক। মাদ্রাজের কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কয়েক বৎসর কর্মরত ছিলেন।

বিজয় মুলে— সরকারী শিক্ষা-উপদেষ্টা, শিক্ষা দপ্তর, নয়া দিল্লী।

ভি. ডি. শর্মা— সচিব, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিভাগ, রাজস্থান সরকার, জয়পুর।

পি. পারিজা— উপাচার্য, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, কটক।

জে. এল. কাউল—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গভর্নমেণ্ট এস. পি. কলেজ, শ্রীনগর।